For More Books & Music Visit www.banglaeye.com
suman_ahm@yahoo.com

TUKUNJIL by MD. JAFAR IQBAL

টুকুনজিল

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

www.banglaeye.com

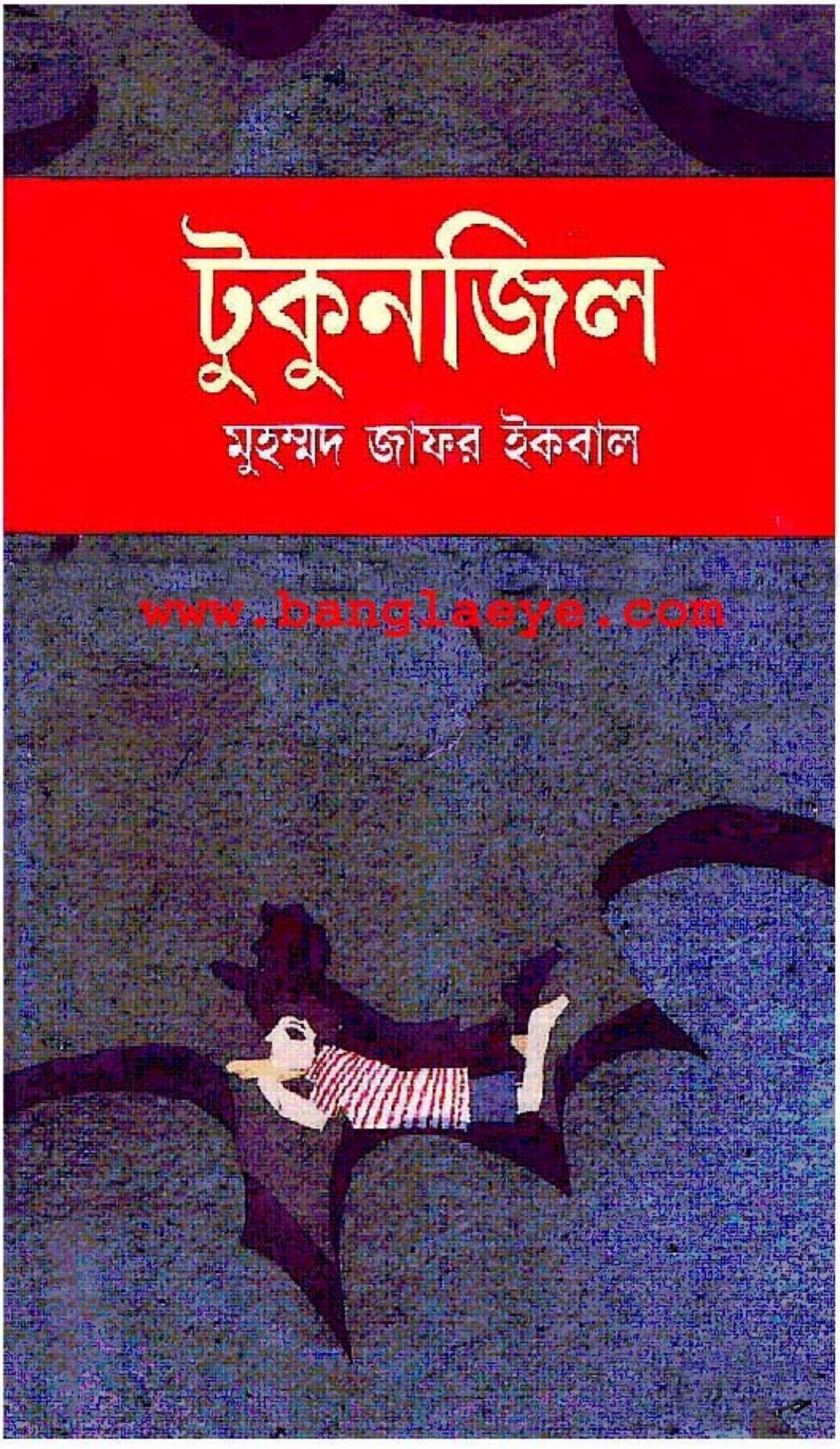

www.banglaeye.com

১. লাল গাড়ি

আমি আর বাবা বাজার করে ফিরে আসছিলাম। বাজারের বড় ব্যাগটা আমার হাতে, বাবার হাতে একটা মাঝারি বোয়াল মাছ। বাবা বোয়াল মাছটাকে উপরে তুলে ধরে রেখে সেটার সাথে কথা বলছেন। তীব্র একটু মাথা-খারাপের ভাব আছে, এটা হচ্ছে তার এক নম্বর লক্ষণ। জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখি, গাছপালা সবার সাথে কথা বলেন। বোয়াল মাছটাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা বোয়াল মিয়া, আপনার শরীরটা ভালো? কোন গাং থেকে এসেছেন?

মাছটি মনে হয় এক্ষুণি ধরে এনেছে, এখনো জ্যান্ত। বাবার কথা শুনেই কি না জানি না, দুর্বলভাবে লেজটা একবার নেড়ে দিল। বাবা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, আপনি বাস্তবিকই সত্যি কথা বলেছেন। নীল গাঙের পানি বড়ই ঘোলা। আপনার বেশি কষ্ট হয় নাই তো?

মাছটির আলাপে বেশি উৎসাহ নেই দেখে বাবা সেটাকে একবার ঝাঁকিয়ে দিলেন, তারপর সেটাকে কানের কাছে ধরে রেখে কিছু-একটা শুনে ফেললেন। মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, খাওয়াদাওয়ার কষ্ট? সেটা কার নাই বলেন, তেয়াত্তর সালে মানুষ পর্যন্ত না খেয়ে রাস্তায় মরে আছে—

আমি বললাম, বাবা, তুমি আসলেই মাছের কথা শুনতে পাও?

বাবা অবাক হয়ে বললেন, কেন শুনতে পাব না?

কেমন করে শোন?

ওরা বলে, তাই শুনি।

আমরা তো শুনি না।

বাবা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, শুনতে চাইলে সবাই শুনতে পারে। কেউ তো শুনতে চায় না।

তুমি আমাকে শোনাতে পারবে?

বাবা চোখ উজ্জ্বল করে বললেন, কেন পারব না? এক শ' বার পারব। তুই শুনবি?

আমি বললাম, শুনব।

www.banglaeye.com

বাবা বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বললেন, নে, ব্যাগটা রাখ্। তারপর চোখ বন্ধ করে গাছের সাথে তোর কানটা লাগা। যখন গাছের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পারবি তখন বলবি, জনাব গাছ, আপনার শরীরটা ভালো?

আমি বললাম, আপনি করে কেন বলতে হয়?

কত বয়স গাছের, সমান করে কথা বলতে হয় না? নে, ব্যাগটা আমার হাতে দে।

সড়ক দিয়ে আরো কত লোকজন যাচ্ছে–আসছে এর মাঝে চোখ বন্ধ করে গাছের সাথে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কেমন করে? এমনিতেই বাবার একটু মাথা–খারাপ বলে আমাদের কত যন্ত্রণা, চেনা কেউ–একজন দেখে ফেললে কোনো উপায় আছে? আমি বললাম, থাক থাক বাবা, আরেকদিন শুনব।

বাবার মন–খারাপ হল, মুখটা কালো করে বললেন, এই জন্যে তোরা শুনতে পারিস না, তোদের শোনার আগ্রহ নাই।

বাবা আরো কী বলতে চাইছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দূরে কী দেখে থেমে গেলেন। আমিও তাকালাম, দূরে ধুলা উড়িয়ে সড়ক দিয়ে শব্দ করে কী–একটা আসছে। গ্রামের সড়ক, একটা দুইটা রিকশা ছাড়া কিছু যায় না। মাঝে মাঝে পাশের গঞ্জ থেকে একটা পুরানো ট্রাক আসে। মেম্বার সাহেব একটা মোটর সাইকেল কিনেছেন, তাঁর বড় শালা মাঝে মাঝে ফটফট শব্দ করে সেটা নিয়ে বেড়ায়, এর বেশি কিছু নেই। আমিও তাকিয়ে রইলাম, প্রচণ্ড শব্দ করে ধুলা উড়িয়ে লাল রঙের একটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এই সড়ক দিয়ে গাড়ি খুব একটা আসে না, আশেপাশে যারা ছিল সবাই হাঁ করে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বাবাও খানিকক্ষণ অবাক হয়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ইস্! কী একটা জিনিস!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, গাড়ি যায় কেমন করে, বাবা?

বাবা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ভিতরে একে হয় পাওয়ার আছে। যখন পাওয়ার সামনে দেয় তখন সামনে যায়, যখন পিছনে দেয় তখন পিছনে যায়। পাওয়ার হচ্ছে বড় জিনিস, যার পাওয়ার নাই তার কিছু নাই।

কথাটার কি মানে আমি ঠিক বুঝলাম না, পাগল মানুষ; যখন যেটা মনে হয় সেটা বলে ফেলেন, লোকজন শুনে হাসাহাসি করে। খুব খারাপ লাগে তখন। আমার যখন অনেক পয়সা হবে তখন বাবাকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাব, আজকাল নাকি পাগলের চিকিৎসা হয়।

বাবার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়।

বাড়ির সামনে এসে দেখি সেখানে মহা ভিড়। লাল গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর সেটাকে ঘিরে অনেক লোকজন। সবাই গাড়িটা একবার ছুঁয়ে দেখতে চায়। কুলপ্যান্ট পরা একজন মানুষ—নিশ্চয়ই গাড়ির ড্রাইভার হবে, মুখের কোনে একটা সিগারেট কামড়ে ধরে হুঙ্কার দিয়ে বলছে, খবরদার, কেউ কাছে আসবে না, একেবারে জানে মেরে ফেলব।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম যে, ছোট খালা এসেছেন। ছোট খালা আসছেন

==

www.banglaeye.com
==========

আমাদের বড়লোক আত্মীয়দের মাঝে এক নম্বর। চেহারা খুব ভালো বলে নানাজান অনেক বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছোট খালু ইঞ্জিনিয়ার, জার্মানি বা আমেরিকা কোথায় জানি গিয়েছিলেন, সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছেন। এটা নিশ্চয়ই সেই গাড়ি।

আমি প্রায় ছুটে ভিতরে ঢুকে গেলাম, বাইরে যেরকম ভিড়, ভিতরেও সেরকম ভিড়। উঠানের মাঝখানে একটা চেয়ারে ছোট খালা বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে পাড়ার সব বৌ-ঝিরা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট খালা দরদর করে ঘামছেন, রাঙা বুবু একটা হাতপাখা দিয়ে তাঁকে প্রাণপণে বাতাস করে যাচ্ছে। ছোট খালা একসময়ে নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু এখন আর দেখে বোঝা যায় না, মোটা হয়ে গোল একটা কলসির মতো হয়ে গেছেন। গায়ের রং অবশ্যি ধবধবে ফর্সা, কেমন যেন একটা গোলাপী আভা। তার পাশে আমার মা'কে দেখাচ্ছিল শুকনা, কালো এবং অনেক বেশি বয়স।

আমি ছোট খালু কিংবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের খুঁজে পেলাম না, মনে হয় ড্রাইভারকে নিয়ে একাই এসেছেন। মা তাঁর ছোট বোনকে দেখে খুব খুশি হয়েছেন, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আমাকে দেখে বললেন, বিলু, তোর ছোট খালাকে সালাম কর।

আমি ব্যাগটা রেখে ছোট খালাকে সালাম করতে এগিয়ে যেতেই ছোট খালা পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন, থাক, থাক, সালাম করতে হবে না।

আমি তবুও হামলে পড়ে সালাম করে ফেললাম। ছোট খালা বললেন, তুই বিলু কত বড় হয়েছিস দেখি!

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে শুধু বোকার মতো একটু হাসলাম। ছোট খালা বললেন, স্কলারশিপ পেয়েছিস শুনলাম, খুব ভালো, খুব ভালো।

মা বললেন, এই সংসারে কি পড়ার সময় পায়? তার মাঝে বৃত্তি পেয়ে গেল, ডিস্ট্রিক্টের মাঝে এক নাম্বার।

মা এমনভাবে বললেন যে শুনে আমি নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম। কিছু-একটা বলতে হয়, কিন্তু কী বলব বুঝতে পারলাম না, পায়ের নখ দিয়ে উঠানের মাটি খুঁচিয়ে তুলতে থাকলাম। মা জিজ্ঞেস করলেন, তোর বাবা কই?

বাইরে। গাড়ি দেখছেন। কী সুন্দর গাড়ি মা! তুমি দেখেছ?

ছোট খালা খুশি হয়ে বললেন, কই আর সুন্দর। মেটাল কালার চাচ্ছিলাম, পাওয়াই গেল না।

মা বললেন, তোর বাবাকে ডেকে আন্ গিয়ে, যা।

আমি ছুটে বের হয়ে গেলাম।

বাবা ছোট খালাকে দেখেই বললেন, শানু, তুমি এত মোটা হলে কেমন করে? ভালোমন্দ অনেক খাও মনে হয়!

বাবা পাগল মানুষ, কখন কী বলতে হয় জানেন না, যখন যেটা মুখে আসে বলে ফেলেন। বাবার কথা শুনে ছোট খালা একেবারে পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে গেলেন। তাই দেখে মা খুব রেগে গেলেন, বললেন, কী-সব কথা বলেন আপনি, মাথামুণ্ডু কিছু নাই।

www.banglaeye.com
==========

বাবা মুখ গম্ভীর করে বললেন, ভুল বলছি আমি? তুমি তো মোটা হও নাই—হয়েছ? ভালোমন্দ খেতে পাও না, কেমন করে মোটা হবে?

মা লজ্জায় একেবারে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে বললেন, আপনি এখন যান তো দেখি।

ঠিক তখন একটা মোরগ কঁক কঁক করে ডেকে উঠল, হয়তো আকাশে একটা চিল উড়ে যেতে দেখেছে বা অন্য কিছু। বাবা লাফিয়ে উঠে বললেন, ঐ দেখ, মোরগটাও বলেছে, দেখেছ? দেখেছ?

বাবা মোরগটার দিকে এগিয়ে গেলেন, ভুল বলেছি আমি? ভুল বলেছি?

লজ্জায় দুঃখে মায়ের চোখে একেবারে পানি এসে যাচ্ছিল। ছোট খালা সামলে নিয়ে বললেন, দুলাভাই তো দেখি একেবারে বদ্ধ পাগল! বুবু, তোমার একি অবস্থা? ছেলেপুলে নিয়ে কী করবে তুমি?

মা লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহ্ দিয়েছে, আল্লাহ্ দেখবে।

আমি আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম, মনটা কেন জানি খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরবেলা খেতে বসে ছোট খালা শুধু ছটফট করলেন। বাসায় চেয়ার-টেবিলে বসে খান, এখানে মেঝেতে মাদুর পেতে বসতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। ছোট খালা বেশি কিছু খেলেনও না, খাবারগুলো শুধু হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। এত কম খেয়ে ছোট খালা এত মোটা হলেন কেমন করে কে জানে!

খাবারের মাঝামাঝি হঠাৎ ছোট খালা বললেন, বুবু, বিলুকে নিয়ে যাই আমার সাথে, ঢাকায় থেকে পড়াশোনা করবে।

আমার নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, এত বড় কপাল কি আমার সত্যি কখনো হবে? মায়ের মুখের দিকে তাকালাম, মা কি রাজি হবেন? যদি না বলে বসেন?

মা কোনো উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বাবার দিকে তাকালেন। বাবা বোয়াল মাছের মাথাটা খুব যত্ন করে চুষছেন, ছোট খালার কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না।

ছোট খালা আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী বল, বুবু?

উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হল। ছোট খালার বাসায় থাকব আমি? লাল গাড়ি করে যাব-আসব আমি? ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে খাব? আমি আবার মায়ের মুখের দিকে খুব আশা নিয়ে তাকালাম। মা খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে খুব আস্তে আস্তে বললেন, ঠিক আছে শানু।

আমার ইচ্ছে হল খুশিতে একটা লাফ দিই, অনেক কষ্ট করে নিজেকে থামিয়ে রাখলাম।

ছোট খালা বললেন, আজই চলুক আমার সাথে। গাড়ি করে চলে যাবে।

মা একটু চমকে উঠে বললেন, আজই?

আমি উদগ্রীব হয়ে বললাম, হ্যাঁ মা, যাই?

মায়ের মুখে কেমন জানি একটা দুঃখের ছায়া পড়ল। আবার বাবার দিকে তাকালেন, বাবা তখনো গম্ভীর মুখে মাছের মাথাটা চুষছেন। মা খুব আস্তে আস্তে, প্রায় শোনা যায় না স্বরে বললেন, ঠিক আছে শানু।

www.banglaeye.com
==========

গাড়ির চারদিকে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার জোরে জোরে দুইটা হর্ন দিল, তবু সামনে থেকে কেউ নড়ল না। ড্রাইভার চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতেই সবাই একটু সরে দাঁড়াল। বড়রা তখন ছোট বাচ্চাদের ঠেলে ঠেলে সরিয়ে গাড়িটা যাবার একটা জায়গা করে দিল। আমি গাড়ির সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছি, ছোট খালা বসেছেন পিছনে। গাড়ির পিছন থেকে সবকিছু অন্যরকম দেখায়। নিজেকে কেমন জানি রাজা রাজা মনে হয়।

আমি বাড়ির ভিতরে তাকালাম, বেড়ার ফাঁক দিয়ে মা তাকিয়ে আছেন। মায়ের চোখে আঁচল। মায়ের পিছনে রাঙাবুবু। বড় বুবু শ্বশুরবাড়ি থেকে আসতে পারে নি। লাবুটা বোকার মতন চিৎকার করে কাঁদছে, সেও আমার সাথে গাড়ি করে যেতে চায়। রশীদ চাচা তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। এক পাশে দুলাল আমার লাইব্রেরির বই কয়টা শক্ত করে বুকে চেপে ধরে রেখে কেমন জানি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দুলাল হচ্ছে আমার প্রাণের বন্ধু—এরকম হঠাৎ করে এভাবে চলে যাব সে এখনো বিশ্বাসই করতে পারছে না। দুলালকে আমি সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, আমার লাইব্রেরির সবগুলো বই, আমাদের গ্রিন বয়েজ ক্লাবের ফুটবলটা, দেয়াল-পত্রিকার লেখাগুলো। এতগুলো ঝামেলা সে একা কেমন করে সামলাবে কে জানে।

ড্রাইভার ঠিক যখন গাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে জানি বাবা এসে হাজির হলেন। গাড়ির জানালা দিয়ে অবাক হয়ে ভিতরে আমার দিকে তাকালেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, এইটা কে, বিলু না?

আমি মাথা নাড়লাম।

বাবা বললেন, ভিতরে বসে আছিস যে? গাড়ি যে ছেড়ে দেবে এক্ষুনি—

আমি বললাম, বাবা, আমি তো ছোট খালার সাথে যাচ্ছি।

কী বললি?

আমি ছোট খালার সাথে যাচ্ছি।

কোথায়—

আমি কিছু বলার আগেই ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। ধুলা উড়িয়ে বাবাকে পিছনে ফেলে গাড়ি ছুটে চলে গেল সামনে। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম বাবা অবাক হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমার প্রথমবার কেমন জানি একটু মন-খারাপ হয়ে গেল।

২. বন্টু

ছোট খালার বড় ছেলের নাম বন্টু। ভালো একটা নাম আছে, শাহনাওয়াজ খান না কি যেন, কিন্তু সবাই তাকে বন্টু বলেই ডাকে। বন্টু কারো নাম হয় আমি জানতাম না, কিন্তু তাকে দেখে মনে হল বন্টু নামটা তার জন্যে একেবারে মানানসই। গাট্টাগোট্টা শরীর, মাথাটা ধড়ের উপর বসানো। বয়সে আমার সমান কিন্তু লম্বায় আমার থেকে

www.banglaeye.com
==========

অন্তত আধহাত ছোট। আমাকে প্রথমবার দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, এইটা কে?

ছোট খালা বললেন, বিলু, তোর খালাতো ভাই।

যার বাবা পাগল?

ছোট খালা ধমক দিয়ে বললেন, ছিঃ। এইভাবে বলে না।

বন্টু মুখ গোঁজ করে জিজ্ঞেস করল, কতদিন থাকবে?

ছোট খালা বললেন, ছিঃ বন্টু! এইভাবে কথা বলে না।

তার মানে অনেক দিন। বন্টু মুখ লম্বা করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, কোন ক্লাসে পড়ে?

আমি উত্তর দিলাম, বললাম, সেভেন।

রোল নাম্বার কত?

এক।

সাথে সাথে বন্টুর মুখটা কালো হয়ে গেল। প্রথমে দেখা হওয়ামাত্র কাউকে তার রোল নাম্বার জিজ্ঞেস করা মনে হয় ঠিক না। কিন্তু আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছে, আমি কেন করব না? কারো রোল নাম্বার তো আর এক থেকে কম হতে পারে না। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার রোল নাম্বার কত?

বন্টু উত্তর দেবার আগেই তার ছোটজন মিলি একগাল হেসে বলল, ভাইয়া পরীক্ষায় লাড্ডা গাড্ডা! সব সাবজেক্টে রসগোল্লা!

বলামাত্র বন্টু তার ছোট বোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিল।

আমি বুঝতে পারলাম, এই বাসায় বন্টু হবে আমার শত্রুপক্ষ। নিয়ম অনুযায়ী মিলি হওয়া উচিত মিত্রপক্ষ, কিন্তু এসব ব্যাপারে কিছু জোর দিয়ে বলা যায় না।

রাতে খাবার টেবিলে ছোট খালুর সাথে দেখা হল। অনেক দিন আগে জার্মানি না আমেরিকা থেকে একটা রঙিন ছবি পাঠিয়েছিলেন। সেই ছবিতে ছোট খালু সারা গায়ে জাব্বাজোব্বা জড়িয়ে একটা শাবল দিয়ে বাসার সামনে বরফ পরিষ্কার করছিলেন। ধবধবে সাদা বরফের সামনে তাকে দেখাচ্ছিল বেগুনি রঙের। মানুষের রং বেগুনি হয় কেমন করে সেটা নিয়ে আমার সবসময়েই একটু কৌতূহল ছিল। আজ দেখলাম রংটা বেগুনি নয়, তবে একটু কালোর দিকে। আমার সাথে ছোট খালুর একটু কথাবার্তা হল। জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির সবাই ভালো?

জ্বি।

তোমরা তো চার ভাই-বোন?

জ্বি।

শিউলি, রানু, তারপর তুমি। তোমার পরে একজন ভাই।

জ্বি।

ভাইয়ের নাম যেন কি?

লাবু। ভালো নাম আতাউল করিম।

ও আচ্ছা। বেশ বেশ। ছোট খালু খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন, শিউলির তো

www.banglaeye.com
==========

বয়স বেশি না, এর মাঝে বিয়ে হয়ে গেল?

জ্বি।

পড়াশোনাটা শেষ করলে হত।

ছোট খালা নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা নিঃশ্বাস বের করে বললেন, গ্রামের ব্যাপার, ঢ্যাঙা একটা মেয়েকে স্কুলে পাঠাবে কেমন করে?

ছোট খালু বললেন, পড়াশোনায় তো ভালো ছিল, তাই না?

জ্বি।

খালু চুকচুক শব্দ করে বললেন, মেয়েদের পড়াশোনাটা খুব দরকার, খুব দরকার।

ছোট খালু মানুষটাকে দেখে রাগী রাগী মনে হয়, কিন্তু আসলে মনে হয় রাগী নয়। মনটা খুব ভালো। একবার মনে হল সত্যি কথাটি বলে দিই, যে, বাবা পাগল বলে বড় বুবুর বিয়ের কোনো প্রস্তাবই আসছিল না। তাই যখন বিয়ের একটা প্রস্তাব এসেছে, তাড়াহুড়ো করে সবাই মিলে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি কিছু বললাম না, বাবার পাগলামি নিয়ে কোনো কথা বলতে আমার একেবারে ভালো লাগে না।

রাত্রে ঘুমানোর সময় একটা সমস্যা দেখা দিল, আমি কোথায় ঘুমাব সেটি ঠিক করা হয় নি। মিলি আর বন্টুর আলাদা ঘর, দু'জনের জন্যে দুটি আলাদা বিছানা। ছোট খালা আমাকে বন্টুর সাথে শোওয়ার কথা বলামাত্রই সে নাক ফুলিয়ে একরকম ফোঁস ফোঁস জাতীয় শব্দ শুরু করে দিল। ছোট খালু কড়া স্বরে বন্টুকে কী-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে থামিয়ে বললাম, খালু, আমি কি নিচে শুতে পারি?

নিচে? মেঝেতে?

জ্বি। একটা বালিশ আর একটা চাদর হলেই হবে।

ছোট খালু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, আমার আসলে একলা শোয়াই ভালো।

কেন?

আমি নাকি ঘুমের মাঝে শুধু উল্টাপাল্টা করি। রাঙাবুবু বলেছে। আমি অবশ্যি টের পাই না। কিন্তু যে আমার সাথে ঘুমায় সে টের পায়।

মিলি বলল, কিন্তু ভাইয়ার মতো তো আর তুমি বিছানায় পি—

বন্টু একটা হুঙ্কার দিল বলে মিলি কথা শেষ করতে পারল না, কিন্তু শব্দটা নিশ্চয়ই 'পিশাব'-ই হবে!

আমাকে সে-রাতের মতো মেঝেতে বিছানা করে দেয়া হল। নিচে তোশক তৈরি করা হয়েছে একটা লেপ ভাঁজ করে। মশারিটাও টানাতে হয়েছে খুব কায়দা করে, তিনটি কোনা উঁচু, কিন্তু চার নাম্বার কোনাটি ঝুলে পড়ে সেটাকে একটা কালবোশেখির ঝড়ে ভেঙে-পড়া বাসার মতো দেখাতে লাগল।

রাতে একা-একা বিছানায় শুয়ে রইলাম। বাড়িতে আমি আর লাবু রাঙাবুবুর সাথে ঘুমাই। ঘুমানোর আগে লাবু বলে, রাঙাবুবু, একটা গল্প বল।

আমি কিছু বলি না, এত বড় হয়ে গেছি, গল্প বলার কথা বলি কেমন করে? রাঙাবুবু প্রথমে বলে, ঘুমা ঘুমা, কত রাত হয়েছে দেখেছিস?

www.banglaeye.com
==========

বাবু তখন ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে, তখন আমিও বলি, বল্–না একটা গল্প, রাঙাবুবু।

আমি শুনতে চাইলে রাঙাবুবু খুব খুশি হয়, তখন বলে, কোনটা শুনবি?

আমি কোনোদিন বলি রবিনসন ক্রুসো, কোনোদিন বলি যখের ধন। সব বই আমিও পড়েছি, রাঙাবুবুর জন্যে বই তো আমিই আনি লাইব্রেরি থেকে। সব আমার জানা গল্প, তবু রাঙাবুবুর মুখ থেকে শুনতে এত ভালো লাগে! সব যেন একেবারে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে যায়।

রাঙাবুবু যখন গল্প শুরু করে, কী ভালোই না তখন লাগে।

আজকে আমি একা। ঘরে কি সুন্দর একটা নীল বাতি জ্বলছে, সবকিছু আবছা আবছা দেখা যায়, মনে হয় ঘরের ভিতর যেন জোছনা হয়েছে। কেমন জানি অবাস্তব মনে হয় সবকিছু। ঘুমের মাঝে বন্টু নড়াচড়া করছে, শুনলাম দাঁত কিড়মিড় করে বিড়বিড় করে বলছে, ফাটিয়ে ফেলব, একেবারে ফাটিয়ে ফেলব।

কে জানে আমাকে লক্ষ করেই বলছে কি না!

৩. নূতন স্কুল

বন্টুর স্কুলে সিট পাওয়া গেল না বলে আমাকে অন্য একটা স্কুলে ভর্তি করা হল, স্কুলটা বাসা থেকে বেশ দূরে। নূতন স্কুলে আমাদের ক্লাস–টিচারের বেশ বয়স। চোখে চশমা, মুখে গোঁফ এবং কেমন জানি একটু রাগী রাগী চেহারা। প্রথম দিন আমাকে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত একনজর দেখে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, নাম কি?

বিলু বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে ভালো নামটি বললাম, নাজমুল করিম।

বাসায় কী ডাকে? নাজমুল, না করিম?

বাসায় ডাকে বিলু।

বিলু? স্যার হাত নেড়ে বললেন, মাথায় কি আছে ঘিলু?

ক্লাসের সবাই হো হো করে হেসে উঠল, তখন আমিও একটু সহজ হলাম। স্যারের চেহারাটা রাগী রাগী, কিন্তু মানুষটা মনে হয় খুব ভালো। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, কোন স্কুল থেকে এসেছিস?

নীলাঞ্জনা হাই স্কুল।

নীলাঞ্জনা? বাহ্, কী সুন্দর নাম। কোথায় স্কুলটা?

আমাদের গ্রামে। রতনপুর স্টেশন থেকে চার মাইল পুব দিকে।

রতনপুর? সেটা কোথায়?

আমার খানিকক্ষণ লাগল স্যারকে বোঝাতে জায়গাটা কোথায়। ভেবেছিলাম চিনবেন না, কিন্তু অবাক ব্যাপার, স্যার ঠিকই চিনলেন। মাথা নেড়ে বললেন, তুই তো তাহলে একেবারে একটা গ্রামের স্কুল থেকে এসেছিস! ভেরি ইন্টারেস্টিং। কী রকম পড়াশোনা হয় আজকাল বল্ দেখি?

ভালোই হয়।

www.banglaeye.com
==========

ছাত্র কয়জন?

আমি মাথা চুলকালাম, স্কুলে ছাত্র কয়জন কখনো তো বের করার চেষ্টা করি নি। অ্যাসেমব্লির সময় মাঠের আধাআধি প্রায় ভরে যায়—কিন্তু সেটা তো উত্তর হতে পারে না। ইতস্তত করে বললাম, অনেক।

অনেক? এটা আবার কী রকম উত্তর হল? একটা নাম্বার বল্।

জানি না স্যার।

তোর ক্লাসে কয়জন ছাত্র?

এখন তিরিশ জন। বর্ষার সময় কমে যায়, যাতায়াতের অসুবিধে, তাই।

কী রকম অসুবিধে?

পানি উঠে যায়। রাস্তাঘাট ডুবে যায়। অনেক ঘুরে বড় সড়ক দিয়ে যেতে হয়। কাদা-পানিতে হাঁটা খুব শক্ত।

ক্লাসের একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল, তখন কি তোমরা বুট পরে যাও?

স্যার হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, ধুর বোকা। গ্রামের ছেলেদের বুট-ফুট লাগে না, তারা খালি পায়েই হেঁটে যেতে পারে।

স্যার ঠিকই বলেছেন, জুতা আমি বলতে গেলে কখনই পরি নি। এখন পরে আছি, কিন্তু সেটা তো স্কুলের পোশাক, সাদা শার্ট, নীল প্যান্ট আর কালো জুতা।

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, গ্রাম থেকে হঠাৎ চলে এলি যে?

আমার ছোট খালার বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে এসেছি, স্যার।

ও। তাহলে তোর আব্বা-আম্মা কোথায় আছেন?

বাড়িতে।

ও। ও। স্যার মাথা নেড়ে চুপ করে গেলেন। একটু পরে বললেন, যা গিয়ে বস। নূতন নূতন তোর একটু অসুবিধে হতে পারে, আমাকে বলিস।

আমি পিছনের দিকে গিয়ে একটা খালি সিটে বসলাম, একজন একটু সরে আমাকে জায়গা করে দিল। আমাকে খুব ভালো করে লক্ষ করল ছেলেটা। ক্লাসে নূতন ছেলে এলে মনে হয় এভাবে লক্ষ করতে হয়।

ঘন্টা পড়ার পর স্যার চলে যেতেই দু'জন ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। একজন ফর্সা মতো শুকনো, অন্যজন বেশ গাট্টাগোট্টা। ফর্সা মতন ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, বর্ষাকালে তুমি কি লুঙ্গি পরে স্কুলে যেতে?

ছেলেটা কেন এটা জিজ্ঞেস করছে বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করার ধরনটা বেশি ভালো না, কিন্তু তবু আমি উত্তর দিলাম। বললাম, হ্যাঁ। লুঙ্গি না পরে যাওয়া কঠিন। কখনো হাঁটু পানি, কখনো আরো বেশি—

ফর্সা ছেলেটা তার সঙ্গীর পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, দ্যাখ—আমি বলেছি না?

গাট্টাগোট্টা সঙ্গীটি বলল, বাতাসে যখন তোমার লুঙ্গি উড়ে পাছা বের হয়ে যায় তখন তুমি কী কর?

আমি টের পেলাম, আমার মাথার ভিতরে আগুন ধরে গেছে। বাবা পাগল বলে সারা জীবন শুধু লোকজনের টিটকারি শুনে এসেছি, এটা আমার কাছে নূতন কিছু না।

www.banglaeye.com
==========

টিটকারি কেমন করে শুনতে হয় আমার থেকে ভালো করে কেউ জানে না। টিটকারি শুনে কী করতে হয়, সেটাও আমার থেকে ভালো করে কেউ জানে না।

আমি খপ করে ছেলেটার শার্টের কলারটা ধরে বললাম, আমি তোমার মশকরার মানুষ না। আমার সাথে মশকরা কোরো না, দাঁত ভেঙে ফেলে দেব।

ছেলেটা আর যাই করুক, আমার কাছে এই রকম ব্যবহার আশা করে নি—একেবারে থতমত খেয়ে গেল। কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন স্যার এসে গেলেন, কিছু বলতে পারল না। নিজের জায়গায় বসে একটু পরে পরে আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগল। কে জানে ব্যাপারটি ভালো হল কি না—কিন্তু আমি দেখেছি ফিচলে বদমাইশগুলোকে এই ওষুধ দিয়ে খুব সহজে সিধে করে দেয়া যায়।

আমার পাশে যে বসেছিল, সে গলা নামিয়ে বলল, লিটন হচ্ছে জুনিয়ার ব্ল্যাক বেল্ট।

লিটন কে?

তুমি যার কলার ধরেছ।

সে কি?

ব্ল্যাক বেল্ট। নেপালে গিয়েছিল কম্পিটিশানে। সিলভার মেডেল পেয়েছিল।

স্যার হুঙ্কার দিলেন, কে কথা বলে রে?

পাশের ছেলেটি চুপ করে গেল, আমি তাই জানতে পারলাম না ব্ল্যাক বেল্ট মানে কি।

ব্ল্যাক বেল্ট মানে কি জানতে পারলাম টিফিনের ছুটিতে। স্যার বের হয়ে যেতেই গাট্টাগোট্টা লিটন আর ফর্সা মতন চশমা-পরা ছেলেটা আমার কাছে এগিয়ে এল। ক্লাসের বেশির ভাগ ছেলেরা কী ভাবে জানি বুঝে গেছে কী-একটা হবে, সবাই ক্লাসের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

লিটন আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল, এরকম সময় তাই করার নিয়ম, তারপর বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, তোকে আজ কিমা বানাব।

আমার একটুও ভয় লাগল না, জীবনে অনেক মারপিট করেছি, কাজেই জানি এটা এমন কিছু কঠিন জিনিস না। যারা মারপিট করে না, তারা মনে করে ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক কিছু-একটা, খুব ভয় পায়। আমি লিটনের বুকের ধাক্কাটা ফেরত দিয়ে বললাম, আমাকে জ্বালিও না।

লিটন আবার আমার বুকে ধাক্কা দিল, এবারে আরেকটু জোরে, তারপর বলল, একেবারে কিমা বানিয়ে দেব।

মনে হচ্ছে সত্যি মারপিট করতে চায়, অনেক সময় এগুলো ভয় দেখানোর জন্যে করা হয়, কিন্তু মনে হচ্ছে এটা শুধু ভয় দেখানোর জন্যে নয়। মারপিট করার আগে অবস্থাটা একটু বুঝে দেখতে হয়, আমি আশেপাশে তাকালাম। ক্লাসের প্রায় সবাই মজা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মারপিট দেখার মতো মজার ব্যাপার কী হতে পারে? আমিও খুব শখ করে দেখি। শুরু হওয়ার পর কেউ কারো পক্ষ নেবে কি না সেটা হচ্ছে বড় কথা। মনে হয় নেবে না, সাধারণত নেয় না। চশমা-পরা ফর্সা ছেলেটা লিটনের পক্ষ নিতে পারে, কিন্তু দেখে মনে হয় না সে মারপিট করার মতো ছেলে,

==========

একটা কৌৎকা খেলে সিধে হয়ে যাবে।

লিটন আবার বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, শালা।

আমি লিটনের বুকে ধাক্কাটা ফেরত দিয়ে বললাম, গালিগালাজ করবে না।

করলে কী করবি?

তুই তুই করে কথা বলবে না।

এক শ'বার বলব। তুই তুই তুই—

মারপিট করতে চাও?

কান ধরে দশবার ওঠবোস কর্, তা হলে ছেড়ে দেব।

তার মানে আসলেই মারপিট করতে চায়। নূতন স্কুলে নূতন ক্লাসে প্রথম দিনে এসেই মারপিট করাটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু সবই কপাল। আমি বললাম, আয় তাহলে।

লিটন একটু পিছনে সরে গিয়ে দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াল, তারপর কেমন একটু বিচিত্রভাবে আস্তে আস্তে শরীরটাকে নাড়াতে শুরু করল। দেখে মনে হল মারপিট করার ব্যাপারটা খুব ভালো জানে, এই লাইনে নূতন আমদানি না। বলল, আয় শালার ব্যাটা।

আমি বললাম, তুই আয়।

লিটন বলল, সাহস থাকলে তুই আয়।

আমার সাহসের অভাব নেই, কিন্তু প্রথমে আমি তার গায়ে হাত তুলতে চাই না, সেটা ঠিক না। ব্যাপারটা যখন বড়দের সামনে যাবে, তখন কে শুরু করেছে সেটা নিয়ে খুব হৈ চৈ হবে। আমি বললাম, আয় দেখি তোর কত সাহস।

লিটনও এগিয়ে এল না, মারপিটের নিয়মকানুন সেও জানে। বলল, আয় দেখি শালার ব্যাটা। সাহস না থাকলে তোর বাপকে নিয়ে আয়।

আমাকে রাগানোর চেষ্টা করছে। আমাকে রাগানো এত সোজা নয়, কিন্তু বাবাকে টেনে কথা বললে ভিন্ন কথা। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, চিৎকার করে বললাম, খবরদার, বাবাকে নিয়ে কথা বলবি না।

আমি লিটনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর যেটা হল আমি সেটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। লিটন ম্যাজিকের মতো সরে গেল, শুধু তাই না, শূন্যে উঠে এক পাক ঘুরে গেল, তারপর কিছু বোঝার আগে পা ঘুরিয়ে আমার মুখের উপর প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মেরে বসল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম, মাথা ঘুরে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলাম, নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম, পারলাম না। একটা বেঞ্চের মাঝে মাথা ঠুকে গেল, তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে মেঝের উপর আছড়ে পড়লাম।

দাঁত দিয়ে জিব কেটে গেছে। মুখের রক্তের নোনা স্বাদ পাচ্ছি।

কোনোমতে উঠে দাঁড়াতেই লিটন আবার শূন্যে ঘুরে গিয়ে পা দিয়ে আমার মুখে লাথি মারার চেষ্টা করল, সতর্ক ছিলাম বলে কোনোমতে মাথাটা কাটালাম, কিন্তু লাথিটা এসে লাগল বুকে। আমি একেবারে কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে আছড়ে পড়লাম।

নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না, মনে হল বুঝি মরেই যাব। কিন্তু আমি মরলাম না— অপমান সহ্য করার জন্যে মানুষকে মনে হয় বেঁচে থাকতে হয়।

লিটন আমার উপর ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের উপর থুতু দিয়ে বলল, এবারে ছেড়ে

==========

দিলাম। পরের বার জান শেষ করে দেব। জান না শালা তুমি কার সাথে লাগতে এসেছ?

আমি কোনোমতে ওঠার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। লিটন আমার সামনে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা সাক্ষী। কে আগে শুরু করেছে?

কেউ কিছু বলল না।

কে শুরু করেছে?

তবু কেউ কোনো কথা বলল না। ফর্সা মতন চশমা-পরা ছেলেটা আমাকে দেখিয়ে বলল, এই বুদ্ধু।

লিটন একগাল হেসে বলল, হ্যাঁ, এই বুদ্ধু। যেরকম বুদ্ধি সেরকম শাস্তি।

তারপর অনেকটা সেনাপতির মতন ভাব করে ক্লাসঘর থেকে বের হয়ে গেল। সাথে আরো কয়েকজন।

ক্লাসে আমার পাশে যে ছেলেটি বসেছিল, সে আমাকে টেনে তুলে বলল, তোমাকে বলেছিলাম না লিটন ব্ল্যাক বেল্ট। এখন বুঝেছ?

আমি খানিকটা বুঝতে পারলাম। বইপত্রে জুজুৎসুর যে গল্প পড়েছি, সেরকম কিছু-একটা। গল্প পড়েছিলাম, সত্যি যে হতে পারে সেটা কখনো চিন্তা করি নি।

ছেলেটা বলল, তোমার কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে।

আমি কিছু বললাম না, ছেলেটা আবার বলল, লিটন আমাদের ফার্স্ট বয়। তোমার কত বড় সাহস যে লিটনের সাথে মারপিট করতে গেছ?

ফার্স্ট বয়? আমি অবাক হলাম। এরকম আগে কখনো দেখি নি, গুণ্ডাধরনের ছেলেদের সাধারণত পাস করা নিয়েই সমস্যা হয়।

হ্যাঁ। তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমার মাথাটা তখনো হালকা হালকা লাগছে। কপালে দুঃখ আছে কি নেই সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবস্থা নেই। মেঝেতে রক্ত-মেশানো খানিকটা থুতু ফেলে বললাম, তোমরা সবাই লিটনের মতো?

ছেলেটা আমার দিকে অপরাধীর মতো তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, না, আমরা সবাই লিটনের মতো না। কেন?

না, এমনি জানতে চাইলাম।

লিটন হচ্ছে ডেঞ্জামাইস।

কি?

ডেঞ্জামাইস। ডেঞ্জারাস এবং বদমাইশ। লিটনকে একদিন টাইট করবে ব্ল্যাক মার্ডার দল।

কে?

ব্ল্যাক মার্ডার। আমাদের একটা টপ সিক্রেট দল। ভেরি টপ সিক্রেট। এই জন্যে তোমাকে বলা যাবে না।

ও। আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সাবধানে দু'এক পা হাঁটলাম। বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুতে হবে, মুখে লিটনের থুতু। গা ঘিনঘিন করছে।

ব্ল্যাক মার্ডারের সদস্য ছেলেটি আমার সাথে হাঁটতে থাকে, আমাকে বাথরুমটি

==========

দেখিয়ে দেবে। ছেলেটির মনটি বড় নরম, ব্ল্যাক মার্ডারের মতো একটা দলের সদস্য কেমন করে হল কে জানে! আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

আমার নাম? তারিকুল ইসলাম। তারিক ডাকে সবাই।

ক্লাসের প্রথম ছেলেটির সাথে আমার বন্ধুত্ব শুরু হল।

ক্লাসের ঘন্টা পড়ে গেছে। আমি আমার নিজের জায়গায় বসেছি। মুখটা খারাপভাবে ফুলে গেছে, ভিতরে কোথায় জানি কেটে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথা করছে, কিন্তু সে জন্যে আমার যন্ত্রণা হচ্ছে না। আমার যন্ত্রণা হচ্ছে বুকের ভিতরে। রাগে দুঃখে অপমানে ভিতরটা একেবারে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে আমার। তারিক আমাকে একনজর দেখে বলল, তোমার কপালে দুঃখ আছে আজকে।

এই নিয়ে কথাটি সে মনে হয় দুই শ' বার বলে ফেলেছে! আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

তারিক আবার বলল, এখন ভূগোল ক্লাস। ভূগোল স্যারের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র হচ্ছে লিটন।

আমি কিছু বললাম না। তারিক আবার বলল, ভূগোল স্যারের সবচেয়ে প্রিয় খেলা কারাটে।

আমি তখনো কিছু বললাম না। তারিক ফিসফিস করে বলল, ভূগোল স্যার যখন আসবে তখন লিটন স্যারকে বলবে যে তুমি তার সাথে মারপিট করতে গেছ। স্যার তখন রেগে আগুন হয়ে যাবে। ভূগোল স্যার একবার রাগলে একেবারে সর্বনাশ।

আমি তখনো কিছু বললাম না। তারিক বলল, লিটন হচ্ছে ভূগোল স্যারের দিলের টুকরা। স্যার তখন তোমাকে হেড স্যারের কাছে পাঠাবেন। তারপর তোমার বাসায় চিঠি যাবে। তোমার এখন ডেঞ্জুপদ। ডেঞ্জারাস বিপদ। বাসায় এখন চিঠি যাবে—

আমি বললাম, গেলে যাবে। আমি সব ছেড়েছুড়ে বাড়ি চলে যাব। থাকব না এখানে।

আমার চোখে পানি এসে গেল হঠাৎ। তারিককে না দেখিয়ে চোখ মোছার চেষ্টা করলাম, তারিক তবু দেখে ফেলল। জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করে আস্তে আস্তে বলল, কী ডেঞ্জুপদ! তোমার কপালে অনেক দুঃখ আজ।

কিন্তু দেখা গেল সেদিন আমার কপালে আর নূতন কোনো দুঃখ ছিল না। ভূগোল স্যার আসেন নি বলে ক্লাস নিতে এলেন আমাদের সকালের ক্লাস টিচার। ক্লাসে ঢুকে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত তাহলে কী হত, বল্ দেখি?

লিটন বলল, কেমন করে হবে, স্যার? মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য–

স্যার লিটনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, পৃথিবীটা গোল, সে জন্যে আমরা পড়ি ভূগোল। পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত তাহলে আমরা পড়তাম ভূ–চ্যাপ্টা।

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠল আর ঠিক তখন স্যার আমাকে দেখতে পেলেন। সাথে সাথে স্যার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লম্বা পা ফেলে আমার কাছে হেঁটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোর? কী হয়েছে?

আমি লজ্জায় মাথা নিচু করলাম।

==========

স্যার শক্ত হাতে আমার মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তারপর ক্লাসের দিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় বললেন, একে কে মেরেছে এভাবে?

কেউ কোনো কথা বলল না। স্যার হঠাৎ এত জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে মনে হল ক্লাসের ছাদ বুঝি ভেঙে উড়ে যাবে, কে মেরেছে?

পুরো ক্লাস কেঁপে উঠল। লিটন ফ্যাকাসে মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে মারতে এসেছিল, স্যার। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখেন—

স্যার লিটনের কোনো কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। পায়ে পায়ে লিটনের দিকে এগিয়ে গেলেন, চুলের মুঠি ধরে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন নিজের দিকে, তারপর স্থির চোখে তাকালেন তার দিকে।

লিটন কেমন জানি কুঁকড়ে গেল সেই ভয়ংকর দৃষ্টির সামনে, চোখ সরানোর সাহস নেই, ভয়ংকর আতঙ্কে সে তাকিয়ে রইল স্যারের দিকে।

ক্লাসে কোনো পড়াশোনা হল না। স্যার একটি কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। ক্লাসের ছেলেরা একটা টুঁ শব্দ করার সাহস পেল না, চুপচাপ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল নিজের জায়গায়।

ঘন্টা পড়ার পর বের হয়ে যেতে যেতে থেমে গিয়ে স্যার বললেন, বড় দুঃখ পেলাম রে আমি আজ। নূতন একটা ছেলে তোদের ক্লাসে প্রথম দিনেই এত কষ্ট পেল, তোরা কেউ কিছু করলি না।

আমার চোখে পানি এসে গেল হঠাৎ। এরকম একজন মানুষ যদি থাকে তাহলে আমার দুঃখ কি? ছেড়েছুড়ে যাব না আমি, থাকব এখানে। লিটনের মতো দানব আছে সত্যি, কিন্তু তারিকের মতো বন্ধুও তো আছে, স্যারের মতো মানুষও তো আছে, যার হৃদয়টা ঠিক আমার বাবার মতো।

৪. চিঠি

সেদিন বাসায় এসে দেখি আমার তিনটি চিঠি এসেছে। একটিতে টিকিট লাগানো নেই, তাই বেয়ারিং। সেটা বাবা লিখেছেন। অন্য দু'টির একটি লিখেছে মা আর একটি রাঙাবুবু। আরেকটা লিখেছে আমার প্রাণের বন্ধু দুলাল। বেয়ারিং চিঠিটা পয়সা দিয়ে নিতে হয়েছে, আমার খুব লজ্জা লাগল ছোট খালার সামনে। অন্যের চিঠি নাকি খুলতে হয় না, কিন্তু ছোট খালা সবগুলো চিঠি খুলে রেখেছেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমার চিঠি আছে কি না দেখার জন্যে খুলেছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আছে, ছোট খালা?

হ্যাঁ। বুবু লিখেছে একটা। তোকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করছে। ভালো করে একটা চিঠি লিখে দিস।

দেব, ছোট খালা।

তারপর আমি চিঠিগুলো নিয়ে পড়তে বসেছি। প্রথমে পড়লাম মায়ের চিঠি, পড়তে

==========

পড়তে চোখে পানি এসে গেল একেবারে। নানারকম উপদেশ আছে চিঠিতে, ছোট খালা আর খালুর কথা যেন শুনি, বন্টু আর মিলির সাথে যেন ঝগড়া না করি, মন দিয়ে যেন পড়াশোনা করি, শরীরের যেন যত্ন করি, জুম্মার নামাজ কখনো যেন ক্বাজা না করি, রাস্তাঘাটে যেন খুব সাবধানে বের হই, একা একা যেন কোথাও না যাই—এইরকম অনেক কথা।

মায়ের চিঠি শেষ করে রাঙাবুবুর চিঠি পড়লাম। আগে ভেবেছিলাম রাঙাবুবু শুধু সুন্দর করে গল্প বলতে পারে, এখন দেখলাম খুব সুন্দর চিঠিও লিখতে পারে। কী সুন্দর করে চিঠিটাই না লিখেছে। বাড়ির সব খবর দিয়েছে চিঠিতে, লাল গাইটা আমাকে কেমন করে খোঁজ করে, রাতে শেয়াল এসে কেমন করে মোরগ নিয়ে গেছে, বাবা কেমন উল্টাপাল্টা বাজার করে আনছেন, বড়বুবুর ছোট বাচ্চাটি কি রকম দুষ্টু, এইরকম সব মজার মজার খবর। রাঙাবুবুও আবার বড় বোনের মতো উপদেশ দিয়েছে, তারপর লিখেছে আমি যেন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা না করি, কারণ দেখতে দেখতে রোজার ছুটি এসে যাবে, আর তখন আমি বাড়ি চলে আসতে পারব।

রাঙাবুবুর চিঠি শেষ করে আমি পড়লাম দুলালের চিঠি। দুলাল আর আমি একজন আরেকজনকে তুই তুই করে বলি, কিন্তু সে চিঠি লিখেছে তুমি তুমি করে! সারা চিঠিতে অনেকগুলো বানান ভুল। 'ড়' বলে যে একটা অক্ষর আছে মনে হয় সে জানেই না, 'বাড়ি'কে লিখেছে 'বারি', 'পড়া'কে লিখেছে 'পরা'। বানান ভুল থাকুক আর যাই থাকুক, চিঠিটার মাঝে অনেক খবর আছে। আমি নেই বলে গোল্লাছুট খেলা আর জমছে না, এই বছর ফুটবল টিম বেশি সুবিধে করতে পারছে না, মেম্বার সাহেবের ছোট ছেলে যাত্রাদলের একটা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে মেম্বার সাহেব তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন, বাজারের কাছে সে একটা ঘর ভাড়া করে আছে, মাছ-বাজারে আগুন লেগেছিল, বেশি ক্ষতি হওয়ার আগেই আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, নীল গাঙে নাকি একটা মাছ ধরা পড়েছে, সেটার অর্ধেক মানুষ অর্ধেক মাছ, জেলের সাথে কথা বলেছে, তখন জেলে তাকে ছেড়ে দিয়েছে, উল্লাপুরের পীর সাহেব এক টাকার নোটকে দশ টাকার নোট বানিয়ে দিচ্ছেন, খানসাহেবের ছোট ছেলে খৎনা করার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে ইত্যাদি। চিঠির শেষে লিখেছে, গাড়ি চড়ার লোভে তাকে ছেড়ে চলে আসাটা একেবারেই ভালো কাজ হয় নাই। জীবন অল্পদিনের—প্রাণের বন্ধুর মনে আঘাত দেওয়া ভালো কাজ নয়, আল্লাহ্ নারাজ হতে পারেন।

সবার শেষে বাবার চিঠিটা হাতে নিলাম। বেশি বড় চিঠি নয়, রুল-টানা কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা। বাবার হাতের লেখা বেশ ভালো, তবে বেশি লেখেন না। বাবাও আমাকে তুই-তুই করে বলেন, কিন্তু লিখেছেন তুমি করে। বাবা লিখেছেন ঃ

বাবা বিলু ঃ

পর সমাচার এই যে, তুমি চলিয়া যাইবার পর লাল গাইটি অত্যন্ত মন-খারাপ করিয়াছে। গতকল্য সে আমার সহিত দীর্ঘ সময় কথা বলিয়াছে। সে এবং তাহার বাছুর দুইজনেই মনে করে তোমার অবিলম্বে ফিরিয়া আসা উচিত। পশুপাখি সাধারণত সত্য কথা বলিয়া থাকে, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিবা।

বাড়ির পিছনে যে জঙ্গল রহিয়াছে, সেইখানে যে বড় গাবগাছটি রহিয়াছে, সেইটি

==========

আমাকে বড়ই বিরক্ত করিতেছে। গাবগাছটির ধারণা, তাহার উপর একটি দুষ্ট প্রকৃতির ভূত রাত্রিনিবাস করিয়া থাকে। আমি তাহাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করিয়াছি যে পৃথিবীতে ভূত বলিয়া কিছু নাই, সব তাহার মনের ভুল। তুমি আসিয়া তাহাকে একবার বুঝাইলে সম্ভবত সে বিশ্বাস করিবে। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস যে ভূত নিয়া গবেষণা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন, সেইটি অবশ্যি অবশ্যি তাহাকে বুঝাইয়া দিও।

তোমার মাতা তোমার খবরের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া আমি মাছ-বাজারের বড় দাঁড়কাকটিকে তোমার ছোট খালার বাসায় পাঠাইয়াছিলাম। প্রথমে সে এত দূরে উড়িয়া যাইতে রাজি হয় নাই, রাজি করাইবার জন্য তাহাকে একটা কুকী বিস্কুট কিনিয়া দিতে হইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছে যে তুমি ভালোই আছ, কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়া আসিবার জন্য তোমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। মাঝে মাঝে খবরের জন্য আমি তাহাকে তোমার কাছে পাঠাইব। তুমি দেখিলেই চিনিতে পারিবে, সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির এবং ডান পা'টি একটু টানিয়া টানিয়া হাঁটে। তাহার চক্ষু লাল রঙের। তাহাকে দেখিলে তুমি একটি কুকী বিস্কুট কিনিয়া দিও, সে কুকী বিস্কুট খাইতে খুব পছন্দ করে।

তোমার পিতা
ফজলুল করিম।

চিঠিগুলো পড়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম, মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। দূরে অনেকগুলো কাক ঝগড়া করছে, কে জানে এর মাঝে বাবার সেই লাল চোখের দাঁড়কাকটি আছে কি না।

এরকম সময়ে বন্টু এসে বলল, আম্মা বলেছে তোমার বাবার চিঠিটা দিতে।

কেন?

জানি না। মনে হয় আব্বাকে দেখাবে।

আমি বললাম, চিঠিটা নাই।

কেন? কী হয়েছে?

ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

ছিঁড়ে ফেলেছ?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি পকেটে হাত দিয়ে বাবার চিঠিটা ছুঁয়ে সরল মুখে বললাম, আমি সবসময় চিঠি পড়া শেষ হলে ছিঁড়ে ফেলি। রেখে কী হবে?

বন্টু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। আমি তখন বাবার চিঠিটা বের করে আবার পড়তে শুরু করলাম।

==========

৫. ম্যাগনিফাইং গ্লাস

স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি খালুর ছোট ভাই আমেরিকা থেকে বেড়াতে এসেছেন। আমি তাঁকে আগে কখনো দেখি নি, মায়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম। গায়ের রং ছোট খালুর মতো এত কালো নয়, বেশ ফর্সা। কথা বলেন একটু জড়িয়ে জড়িয়ে, বাংলা বললেও মনে হয় ইংরেজি বলছেন।

স্যুটকেস খুলে তিনি দুইটা খেলনা বের করে একটা দিলেন বন্টুকে, আরেকটা মিলিকে, তারপর হঠাৎ সাথে আমাকে দেখে থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, এটা কে?

বন্টু বলল, আমার খালাতো ভাই। গ্রাম থেকে এসেছে। এর বাবা পাগল।

ছোট খালু বন্টুকে একটা রাম-ধমক দিলেন।

খালুর ভাই একবার ছোট খালার দিকে তাকালেন, আরেকবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর আবার ছোটা খালার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাবী, আমি তো জানতাম না, আর কেউ আছে এখানে, তাই শুধু দুইটা খেলনা এনেছি। এখন—

বন্টু ততক্ষণে তার খেলনাটা খুলে ফেলেছে, একটা মেকানো সেট। কী চমৎকার খেলনা, এটা জুড়ে দিয়ে কত রকম জিনিস তৈরি করা যায়। বন্টু "মেকানো সেট—আমার মেকানো সেট" বলে চিৎকার করে খুশিতে লাফাতে লাগল। মিলিও তার খেলনাটা বের করল, কী সুন্দর একটা পুতুল একটা ট্রাই সাইকেলে বসে আছে। পিছনে সুইচটা টিপতেই সেটি বাজনা বাজিয়ে ঘুরতে শুরু করে। ইস, কী সুন্দর!

ছোট খালু বললেন, বন্টু, তোর তো অনেক খেলনা আছে, এইটা বিলুকে দিয়ে দে, আরেক বার—

না না না না না—বলে বন্টু ঠোঁট উল্টিয়ে মুখ বাঁকা করে চিৎকার করে লাফিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমার কিছু লাগবে না, কিছু লাগবে না—

ছোট খালুর ভাই তার স্যুটকেস খুলে এদিক-সেদিক হাতড়ে একটা কলম, একটা রংচঙে নোটবই, আরেকটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে বললেন, তুমি এগুলোর কোনো একটা নিতে চাও?

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটার জন্যে আমার খুব লোভ হচ্ছিল, কিন্তু আমি তবু জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বললাম, আমার কিছু লাগবে না।

নাও, যেটা পছন্দ সেটা নাও।

আমি সাবধানে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নিলাম। হাতের উপর রেখে হাতটা দেখতেই মনে হল একটা দৈত্যের হাত।

ছোট খালুর ভাই হেসে বললেন, এটা দিয়ে শুধু একটা জিনিসে সাবধান, কখনো সূর্যের দিকে তাকাবে না।

আমি মাথা নাড়লাম।

আমার মনে হল ম্যাগনিফাইং গ্লাস থেকে মজার কোনো জিনিস পৃথিবীতে থাকতে পারে না। একটা পিঁপড়াকে দেখলাম ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে, সেটাকে দেখাল একটা ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, দেয়াল থেকে একটা মাকড়সা ধরে এনে দেখলাম, সেটাকে

দেখাল একটা অক্টোপাসের মতো—আমি কখনো অক্টোপাস দেখি নি, কিন্তু দেখতে নিশ্চয়ই এরকম হবে। একটা গাছের পাতাকে ছিঁড়ে দেখলাম, সেটাকে মনে হল বিছানার চাদর। আমি আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম সারাদিন। যেটাই পাই সেটাই দেখি। বাবার চিঠিটাও দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। লাইনগুলোকে মনে হল পীচঢালা রাস্তা।

দু'দিন পর আরো একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করলাম, বইয়ে পড়েছিলাম, সত্যি হতে পারে কখনো চিন্তা করি নি। সূর্যের আলোতে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ধরলে রোদটা এক বিন্দুতে একত্র হয়ে আবার ছড়িয়ে পড়ে। যে-বিন্দুতে সেটা একত্র হয়, সেই বিন্দুটা অসম্ভব গরম। এত গরম যে সেখানে হাত রাখলে হাত রীতিমতো পুড়ে যায়। শুধু তাই নয়, একটা শুকনো কাগজে এই বিন্দুটাতে ঠিকভাবে ধরে রাখতে পারলে সেখানে আগুন পর্যন্ত ধরে যায়। আমি যখন ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম, ঠিক তখন একটা পিঁপড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেটার উপর, সেই বিন্দুটা ধরতেই ফট করে শব্দ করে পিঁপড়াটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

একটা পিঁপড়াকে খামোকা মেরে ফেললাম, বাবা দেখলে কত রাগ করতেন! কতবার পিঁপড়াটার কাছে আমার হয়ে মাফ চাইতেন।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমার সবসময়ের সঙ্গী হয়ে গেল। সবসময় আমার স্কুলের ব্যাগে রাখি, সময় পেলেই সেটা দিয়ে আশেপাশে যা কিছু আছে সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। যে-জিনিসটা এমনিতে দেখতে খুব সাধারণ, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে সেটাকেই কী বিচিত্র, কী অসাধারণ মনে হয়। যে-মানুষ প্রথম এটা আবিষ্কার করেছিল তার নিশ্চয়ই কত আনন্দ হয়েছিল।

আমি তখনো জানতাম না যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি ঘটবে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি দিয়ে।

৬. অবাক পোকা

সেদিন আমাদের স্কুল ছুটি। ছোট খালা বন্টু আর মিলিকে নিয়ে বন্টুর এক বন্ধুর জন্মদিনে বেড়াতে গিয়েছেন। আমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এসব জায়গায় আজকাল আর আমার যাওয়ার ইচ্ছা করে না। কাউকে চিনি না, কিছু না, যাওয়ার পর বন্টু প্রথমেই সবাইকে ডেকে বলবে, এই যে এ হচ্ছে বিলু। এর বাবা পাগল, তাই গ্রাম থেকে আমাদের বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে এসেছে।

তখন সবসময়েই কেউ-না-কেউ জানতে চায় আমার বাবা কেমন করে পাগল হলেন, কী রকম পাগলামি করেন, বেঁধে রাখতে হয় কি না, এইসব। আমার খুব খারাপ লাগে। আমি যেতে চাই না শুনে ছোট খালা বেশি জোর করলেন না, বন্টু আর মিলিকে নিয়ে চলে গেলেন। ছোট খালু সকালেই কী-একটা কাজে বের হয়ে গেছেন, তাই বাসায় থাকলাম আমি একা আর বাসার কাজের ছেলেটা।

আমি প্রথমে টেলিভিশনটা চালিয়ে দেখলাম, সেখানে কিছু নেই, তাই রেডিওটা

চালিয়ে দেখলাম সেখানে যন্ত্রসংগীত হচ্ছে, আমার যন্ত্রসংগীত একেবারেই ভালো লাগে না, তাই রেডিওটা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক তখন খবর শুরু হল। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে কী রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে সেটা বলে খুব একটা আশ্চর্য খবর বলল। গত কয়েক দিন থেকে নাকি পৃথিবীর সব মানমন্দিরে আশ্চর্য এবং রহস্যময় কিছু সংকেত ধরা পড়ছে। সংকেতগুলো থেকে মনে হয় রহস্যময় কোনো-এক মহাকাশযান পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। রাডার বা মহাকাশের টেলিস্কোপ দিয়ে সেটাকে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু দেখা সম্ভব হয় নি। দু'দিন আগে সেই রহস্যময় সংকেত হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেই মহাকাশযান পৃথিবীর কোনো নির্জন এলাকায় নেমেছে কিংবা নামার চেষ্টা করে ধ্বংস হয়ে গেছে।

খবরটা সত্যি বলছে নাকি ঠাট্টা করে বলছে, বুঝতে পারলাম না। খবরে তো আজগুবি জিনিস বলার কথা নয়। আজকাল অবশ্যি কিছুই বলা যায় না, সেদিন একটা পত্রিকায় দেখেছি কে নাকি চোখের দৃষ্টি দিয়ে আকাশের মেঘকে দুই ভাগ করে ফেলে। আরেক জায়গায় দেখেছি কে নাকি যোগ সাধনা করে বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। কে জানে এটাও হয়তো সেরকম কিছু হবে।

আমি রেডিওটা বন্ধ করে আমার ঘরে গেলাম। স্টোররুমের জিনিসপত্র সরিয়ে সেখানে আমার জন্যে একটা বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা ভালোই, একটা ছোট জানালা দিয়ে খানিকটা আকাশ দেখা যায়। আমি এখানে রাতে ঘুমাই, কিন্তু পড়তে বসি বল্টু আর মিলির সাথে এক টেবিলে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রথমে আমি মা'কে একটা চিঠি লিখলাম। বাবাকেও একটা লিখব ভেবে অনেকক্ষণ কাগজ-কলম নিয়ে বসে রইলাম, কিন্তু কী লিখব ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার পাঠানো পাড়কাকটা এসেছিল, একটা কুকী বিস্কুট খেতে দিয়েছি, আমার সাথে অনেকক্ষণ গল্প করেছে—এসব তো আর চিঠিতে লিখতে পারি না। বাবার কথা মনে পড়ে খানিকক্ষণ আমার মন খারাপ হয়ে থাকল, তখন ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাতে নিয়ে আমি ছাদে উঠে গেলাম। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের আরো একটা জিনিস এতদিনে আবিষ্কার করেছি, চোখ থেকে একটু দূরে ধরে রেখে আরো দূরের কোনো জিনিসের দিকে তাকালে সেটাকে সব সময় উল্টো দেখায়। ছাদে বসে রাস্তাঘাট বাড়িঘর সব মানুষকে উল্টো করে দেখতে বেশ মজাই লাগে আমার।

অনেকক্ষণ ছাদে বসে কাটালাম আমি। ছাদের রেলিং দিয়ে একটা পিঁপড়ার সারি চলে গেছে, খুব ব্যস্ত হয়ে কোথায় জানি যাচ্ছে সবগুলো পিঁপড়া। কে জানে পিঁপড়ার কোনো আত্মা আছে কি না—বাবাকে জিজ্ঞেস করলে সবসময় বলবেন, আছে। কিন্তু আসলেই কি আছে? আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে রোদটাকে একবিন্দুতে একত্র করে গোটা দশেক পিঁপড়াকে পুড়িয়ে মেরে ফেললাম, সাথে সাথে পুরো সারিটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আবার কিছু মারব কি না ভাবছিলাম, তখন বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা দেখলে খুব রাগ করতেন, মশা পর্যন্ত মারেন না বাবা। ধরে ধরে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে মশারির বাইরে ছেড়ে দেন।

বাকিগুলো আর কোনো পিঁপড়াকে না মেরে আমি দেখতে শুরু করলাম সারিটা কোথায় যাচ্ছে, রেলিং বেয়ে একবার নিচে নেমে আবার উপরে উঠে এল, একটা ফুটো দিয়ে একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে আবার রেলিঙের উপরে উঠে এল।

==

==========

পিঁপড়াগুলো সারি বেঁধে এসে এক জায়গায় গোল হয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে। বৃত্তের ঠিক মাঝখানে ছোট কালো মতন একটা পোকা, সেটা পিঁপড়া থেকেও ছোট। পিঁপড়াকে আমি আগেও মরা ঘাস-ফড়িং বা তেলাপোকা টেনে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি, কিন্তু এত ছোট পোকাকে এভাবে ঘিরে থাকতে দেখি নি। পোকাটাকে ধরতে যাচ্ছে না কেন বুঝতে পারলাম না। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে মাঝখানের ছোট পোকাটা খুজলির মলম বিক্রি করার চেষ্টা করছে আর সবগুলো পিঁপড়া গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে পোকাটা দেখার চেষ্টা করলাম, খুবই ছোট পোকা, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও সেটাকে খুব ভালো দেখা গেল না। ভালো করে দেখে মনে হল এটা ঠিক পোকা নয়, ছোট গাড়ি কিংবা ট্যাঙ্ক কিংবা প্লেন। কিংবা যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি কোনো-একটা জিনিস। আমি আগেও লক্ষ করেছি, খুব সাধারণ জিনিসকেও ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে খুব বিচিত্র দেখায়। আমি আরো ভালো করে পোকাটা দেখার চেষ্টা করলাম, আর তখন হঠাৎ মনে হল সেটার একটা দরজা খুলে গেল, আর ভিতর থেকে আরো ছোট একটা কিছু বের হয়ে এল। সেটি এদিক-সেদিক তাকিয়ে একটা শুঁড় উপরে তুলে কী করল, আর সাথে সাথে একটা পিঁপড়া এগিয়ে এল তার দিকে। পরিষ্কার মনে হল কিছু কথাবার্তা হল পিঁপড়াটার সাথে, তারপর সেই ছোট জিনিসটা ভিতরে ঢুকে গেল, তার আর কোনো চিহ্ন নাই।

আমি হাঁটু গেড়ে বসে আরো ভালো করে পোকাটা দেখার চেষ্টা করলাম। যতই দেখি জিনিসটাকে ততই যন্ত্রপাতির মতো মনে হয়। অত্যন্ত ছোট কিন্তু অত্যন্ত জটিল একটা যন্ত্র। মনে হচ্ছে উপর থেকে কিছু তামার নল বের হয়ে এসেছে, নিচে দিয়ে মনে হল একটু লাল রঙের আলো বের হচ্ছে। পিছন দিয়ে স্প্রিঙের মতো ধাতব একটা জিনিস। কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখব কি না ভাবছিলাম, তখন হঠাৎ মনে হল যে এটাকে আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কড়া একটা ছ্যাঁকা দিয়ে দেখি।

আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ধরে সূর্যের আলোকে একবিন্দুতে একত্র করে ছোট পোকাটার মাঝে আগুন ধরানোর চেষ্টা করলাম, আর কী আশ্চর্য, হঠাৎ মনে হল জিনিসটা থেকে একঝলক নীল আলো বের হয়ে এল, পিঁপড়াগুলো হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। আমি আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, মনে হল আবার ছোট একটা দরজা খুলে গেল, আর ভিতর থেকে আরো ছোট কী-একটা বের হয়ে শুঁড় উঁচু করে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো শব্দ শুনতে পেলাম, তার মাঝে পরিষ্কার গলায় কে জানি বলল, না-না—গরম দিও না।

আমি ভীষণ চমকে আশেপাশে তাকালাম। কে বলল কথাটা? কেউ তো নেই ছাদে। আবার আমি তাকালাম ভালো করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে। ছোট পোকাটি, যেটি শুঁড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকে মনে হল খুব ছোট একটা মানুষের মতো। মনে হল তার বড় একটা মাথা, এমন কি দু'টি চোখও আছে। যেটাকে শুঁড় ভাবছি সেটা শুঁড় হতে পারে, হাতও হতে পারে। আমি আরো ভালো করে দেখার জন্যে কাছে এগিয়ে যেতেই জিনিসটা আবার নড়ে উঠল, ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তার মাঝে আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম, না, না, কাছে এসো না।

==========

আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাবার মতো আমিও কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? পোকামাকড়ের কথা শুনতে পাচ্ছি? কী সর্বনাশ!

খানিকক্ষণ আমি ছাদে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। বিচিত্র পোকাটাকে একটা রাম-থাবড়া দিয়ে চ্যাপ্টা করে ফেলব কি না ভাবলাম একবার। কিন্তু করলাম না, নিচে থেকে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি নিয়ে এলাম। পোকাটাকে ঘিরে পিঁপড়াগুলো এখনো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে মনে হল তাদের মাঝে উত্তেজনা অনেক বেড়েছে। আমি একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে জিনিসটাকে শিশির ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করলাম। ব্যাপারটা সোজা নয়, মনে হল সেটা থেকে কিছু আগুনের ফুলকি বের হয়ে এল। আর তার থেকেও বিচিত্র ব্যাপার, কে জানি বলল, ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে!

আমি ছেড়ে দিলাম না, সেই বিচিত্র পোকাটিকে হোমিওপ্যাথিক শিশির মাঝে ভরে ফেললাম।

পোকাটির কথা কাউকে বলার ইচ্ছা করছিল। প্রথমে বন্টুকে বলার চেষ্টা করলাম, বললাম, ছাদে একটা পোকা দেখেছি আমি। দেখলে অবাক হয়ে যাবে।

কেন?

পোকাটা কথা বলে—বলতে গিয়ে থেমে গেলাম আমি, বাবার কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

বললাম, নিচে দিয়ে আগুন বের হয়।

ও! ওটার নাম জোনাকি পোকা।

না, জোনাকি পোকা না, জোনাকি পোকা আমি চিনি। জোনাকি পোকা থেকে অনেক ছোট।

জোনাকি পোকার বাচ্চা।

কাছে মিলি দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, ইয়াক থুঃ, পোকা! ছিঃ ছিঃ!

কাজেই আলাপ বেশি দূর এগুতে পারল না। দুলাল থাকলে হত। বিচিত্র ব্যাপারে তার খুব উৎসাহ। দুই মাথাওয়ালা বাছুর হয়েছে শুনলে স্কুল ফাঁকি দিয়ে সে দশ মাইল হেঁটে দেখতে যায়! বাবা থাকলেও হত, পোকামাকড়ের কথা এমনিতেই শুনতে পান, এটার কথা নিশ্চয়ই আরো ভালো করে শুনতেন।

রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যি আমি মোটামুটি পোকাটার কথা ভুলে গেলাম। একটা পোকা কথা বলছে, সেটা তো হতে পারে না। আসলে ঠিক তখন নিশ্চয়ই নিচে রাস্তায় অন্য কোনো মানুষ কারো সাথে কথা বলেছে, আর আমার মনে হয়েছে আমার সাথে কথা বলেছে। বাতি নেভানোর জন্যে যখন উঠেছি, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নিচে তাকালাম, রাস্তায় বাসার সামনে দুটি মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। এত রাতে এখানে মাইক্রোবাস করে কে এসেছে কে জানে!

৭. মহাকাশের প্রাণী

ক্লাসে ঢুকেই স্যার পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে বললেন, কে কে আজ খবরের কাগজ পড়েছে?

==========

দেখা গেল কেউ পড়ে নি। লিটন বলল, কাগজে শুধু রাজনীতির খবর থাকে, স্যার, তাই পড়তে ইচ্ছা করে না।

স্যার বললেন, যে-খবরই থাকুক, খবরের কাগজ পড়তে হয়। স্যার জোরে জোরে পড়লেন, মহাকাশের আগন্তুক।

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, রেডিওতে শুনেছি স্যার এটা আমি। এটা কি সত্যি?

স্যার মাথা নেড়ে বললেন, মনে তো হচ্ছে সত্যি।

অন্য সব ছেলেরা তখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, স্যার তাই পুরো খবরটা পড়ে শোনালেন। আমি রেডিওতে যেটা শুনেছি মোটামুটি সেই খবরটাই, তবে খুঁটিনাটি আরো কিছু বর্ণনা আছে। আমেরিকার এক মানমন্দিরের ডিরেক্টরের কথা আছে, অস্ট্রেলিয়ার একজন মহাকাশ-বিজ্ঞানীর কথা আছে। সবাই বলেছে যে তারা মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে সত্যি একটি রহস্যময় মহাকাশযান পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছিল। তার সাথে নাকি যোগাযোগও করা হয়েছিল। মহাকাশযানটি দেখার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে, রাডার দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে, পৃথিবীর সব টেলিস্কোপ দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মহাকাশযানটি পৃথিবীতে নামার চেষ্টা করেছিল, হয়তো ঠিকমতো নামতে পারে নি, হতে পারে কোনোভাবে বিধ্বস্ত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা যে-এলাকায় সেটা বিধ্বস্ত হয়েছে বলে মনে করছেন, তার মাঝে বাংলাদেশ, বার্মা, ভিয়েতনাম, প্রশান্ত মহাসাগর, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল রয়েছে। পুরো এলাকায় খুব খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে সাথে সাথে কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা বলা হয়েছে।

সারা ক্লাস খুব উত্তেজিত হয়ে গেল। স্যার পায়চারি করতে করতে বললেন, চিন্তা করতে পারিস, যদি সত্যি সত্যি অন্য একটা গ্রহ থেকে একটা প্রাণী এসে হাজির হয় তাহলে কী মজাটাই হবে? দেখতে কেমন হবে বলে মনে হয় তোদের?

লিটন বলল, আমি সেদিন একটা সিনেমা দেখেছিলাম, স্যার। সেখানে দেখিয়েছিল, দেখতে খুব ভয়ঙ্কর।

স্যার বললেন, সিনেমা তো গাঁজাখুরি, আসলে কেমন হবে?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম, বুদ্ধিমান প্রাণীরা দেখতে নাকি মানুষের মতনই হওয়ার কথা। বড় একটা মগজ থাকবে—তার কাছাকাছি থাকবে চোখ, দূরত্ব বোঝার জন্যে সবসময় হতে হবে দু'টো চোখ—

হাত?

আমি মাথা চুলকে বললাম, সেটা কিছু বলে নি। কিন্তু কিছু ধরার জন্য আঙুল না হয় শুঁড় থাকতে হবে।

স্যার মাথা নাড়লেন, ঠিকই বলেছিস। কোন গ্রহ থেকে আসছে তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করবে। সেই গ্রহ কত বড়, মাধ্যাকর্ষণ বল কত বেশি, বাতাস আছে কি নেই, থাকলে কি কি গ্যাস আছে, এইসব। কী মনে হয় তোদের? প্রাণীটা কি হাসিখুশি হবে, নাকি বদরাগী?

লিটন বলল, বদরাগী হবে, স্যার। মহাকাশের প্রাণী সবসময় খুব ডেঞ্জারাস হয়। সবকিছু ধ্বংস করে ফেলে। টিভিতে একটা সিনেমা দেখিয়েছিল—

==========

স্যার বললেন, ধুর! সিনেমা সবসময় গাঁজাখুরি হয়। আমার মনে হয় প্রাণীটা হবে খুব মিশুক। কতদূর থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে ভেবে দেখ্। সে যদি মিশুক না হয় তাহলে কে মিশুক হবে?

পুরো ক্লাস স্যারের সাথে একমত হল। স্যার খানিকক্ষণ হেঁটে আবার বললেন, তারপর চিন্তা করে দেখ্, পৃথিবীটা কত সুন্দর, সেই মহাকাশের প্রাণী দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীর মানুষের সাথে যখন তার পরিচয় হবে তখন মনে হয় সে পৃথিবী ছেড়ে যেতেই চাইবে না। কী বলিস তোরা?

আমরা সবাই জোরে জোরে মাথা নাড়লাম। স্যার বাচ্চা মানুষের মতো ছটফট করতে করতে বললেন, কিন্তু মহাকাশযানটাকে দেখা যাচ্ছে না কেন? বিজ্ঞানীরা সেটাকে দেখতে পেল না কেন?

লিটন বলল, আমি একটা বইয়ে পড়েছি, বোমা ফেলার জন্যে প্লেন তৈরি করেছে যেটা নাকি রাডারে দেখা যায় না। সেরকম কিছু—

স্যার চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন, কিন্তু সেটা তো যুদ্ধ করার প্লেন। মহাকাশের একটা প্রাণী কি যুদ্ধ করতে আসবে?

লিটন বলল, আমি যে সিনেমাটা দেখেছি—

তারিক বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু টেলিস্কোপ দিয়েও তো দেখতে পারে নাই।

স্যার মাথা নাড়লেন, তা ঠিক। তা ঠিক।

মাহবুব বলল, অদৃশ্য কোনো জিনিস দিয়ে হয়তো তৈরি।

অদৃশ্য জিনিস তো কিছু নেই, স্যার মাথা নাড়লেন, যেখান থেকেই আসুক সেটা তৈরি হতে হবে একই জিনিস দিয়ে, যে-এক শ' চারটা মৌলিক পদার্থ আছে, তার বাইরে তো কিছু থাকতে পারে না।

ক্লাসে সবচেয়ে যে কম কথা বলে, সুব্রত, আস্তে আস্তে বলল, এমন কি হতে পারে যে মহাকাশের প্রাণী সাইজে অনেক ছোট হয়, পিঁপড়ার মতো, কিংবা আরো ছোট, যে খালিচোখে দেখা যায় না?

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠল। স্যার নিজেও হাসতে হাসতে ধমক দিলেন সবাইকে, হাসছিস কেন তোরা বোকার মতো? হাসছিস কেন? ছোট তো হতেই পারে—

হাসতে হাসতে হঠাৎ আমি ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো করে চমকে উঠলাম। আমার সেই বিচিত্র পোকাটার কথা মনে পড়ল আর হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম সুব্রত ঠিকই বলেছে, বিজ্ঞানীরা সেটাকে দেখতে পায় নি, কারণ সেটা অনেক ছোট, আমি সেটাকে পেয়েছি, পেয়ে হোমিওপ্যাথিক শিশির মাঝে আটকে রেখেছি।

চিৎকার করে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠছিলাম, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। স্যার একটু অবাক হয়ে বললেন, কি রে বিলু, কিছু বলবি?

না না না, স্যার। আমি আমতা আমতা করে বললাম, ইয়ে, মানে—বলছিলাম, মহাকাশের প্রাণী তো ছোট হতে পারে। পারে না, স্যার?

পারবে না কেন? অবশ্যি পারে। সব প্রাণীরই যে আমাদের মতো সাইজ হতে হবে কে বলেছে? ডাইনোসোর কত বড় ছিল, জীবাণু কত ছোট। কাজেই একটা প্রাণীকে কত বড় হতে হবে তার তো কোনো নিয়ম নেই।

==========

স্যার আরো কি কি বললেন, কিন্তু আমি কিছু শুনছিলাম না। আমার বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ডে ঢাকের মতো শব্দ করছে, উত্তেজনায় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আমি সত্যিই কি মহাকাশের সেই প্রাণীটাকে ধরেছি?

বাসায় গিয়ে সেই প্রাণীটাকে আবার দেখতে হবে, কিন্তু স্কুল ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছিলাম না, তাই অঙ্ক ক্লাসে পেট চেপে কোঁ কোঁ করে স্যারকে বললাম, খুব পেটব্যথা করছে স্যার, বাসায় যেতে হবে এক্ষুণি।

অঙ্ক-স্যার যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন জানতাম না! সকালে কি খেয়েছি, রাতে কি খেয়েছি, দাস্ত হয়েছে কি না, বাহ্যি হয়েছে কি না এইসব একগাদা প্রশ্ন করে দুই দানা অ্যান্টিমনি সিক্স হানড্রেড খাইয়ে বেঞ্চে শুইয়ে রাখলেন। স্যার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন আর পকেটে নানারকম ওষুধ নিয়ে ঘুরে বেড়ান জানলে কখনোই স্যারকে পেটব্যথার কথা বলতাম না! শক্ত বেঞ্চে শুয়ে থাকা আরামের কিছু ব্যাপার নয়, তাই একটু পরে বললাম যে আমার পেটব্যথা কমে গেছে। শুনে অঙ্ক স্যারের মুখে কী হাসি।

বিকেলে বাসায় এসে আমি দৌড়ে আমার ঘরে গেলাম। বালিশের নিচে হোমিওপ্যাথিক শিশিতে সেই পোকাটি রেখেছিলাম—যেটা হয়তো আসলে মহাকাশের সেই রহস্যময় প্রাণী। আমি সাবধানে সেই শিশিটা হাতে নিলাম, এক কোনায় কালো বিন্দুর মতো সেই জিনিসটি। আমি আস্তে আস্তে শিশিতে একটা টোকা দিলাম, সাথে সাথে ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তারপর ভিতর থেকে কে যেন ক্ষীণ স্বরে বলল, সাবধান।

উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হল। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বের করে ভালো করে সেটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, অবিশ্বাস্য রকম জটিল একটা যন্ত্র। তার ভিতর থেকে একটা ফুটো দিয়ে মাথা বের করে একটি অত্যন্ত ছোট প্রাণী আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সত্যি সত্যি একটা বড় মাথা আর দু'টি চোখ। বুদ্ধিমান প্রাণীর যে-রকম থাকার কথা। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

প্রাণীটি খানিকক্ষণ ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করল, তারপর বলল, তুমি কে?

আমি বিলু।

বিলু। বিলু দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন।

হোমোস্যাপিয়েন মানে মানুষ, প্রাণীটি আমাকে দায়িত্বহীন মানুষ বলছে, আমি নিশ্চয়ই কিছু-একটা কাজ খুব ভুল করেছি। ঢোক গিলে বললাম, আমি আসলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই নি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই—

ঠিক তখন ছোট খালা ঘরে উঁকি দিলেন, আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে কথা বলছিস রে, বিলু?

আমি চট করে শিশিটা বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেললাম, কিন্তু কোনো লাভ হল না, প্রাণীটা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন! দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন!!

==========

ছোট খালা প্রাণীটির কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না, আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে কথা বলছিলি?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কারো সাথে না, ছোট খালা।

প্রাণীটা তখনও চিৎকার করছে, দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন।

ছোট খালা মনে হল কিছু–একটা শুনলেন, ঘরে মাথা ঢুকিয়ে বললেন, ঘরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে?

আমি ঢোক গিলে বললাম, হ্যাঁ।

ছোট খালা খানিকক্ষণ ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনে আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন। আমি তখন আর শিশিটা বের করার সাহস পেলাম না। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। খুব সাবধানে।

রাতে খাবার টেবিলে আমি ছোট খালুকে জিজ্ঞেস করলাম, খালু, কেউ যদি মহাকাশের সেই প্রাণীকে দেখতে পায় তাহলে তার কী করা উচিত?

খালু অবাক হয়ে বললেন, মহাকাশের কী প্রাণী?

আমি বললাম, খবরের কাগজে যে উঠেছে।

কী উঠেছে?

আমি খবরটা বললাম, ছোট খালু খবরটাকে মোটেও গুরুত্ব দিলেন না। হাত নেড়ে বললেন, ধুর, সব লোক–ঠকানোর ফন্দি। খবরের কাগজ বিক্রি করার জন্যে যত সব গাঁজাখুরি গল্প!

কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে কার সাথে যোগাযোগ করবে?

সত্যি হবে না।

যদি হয়?

ছোট খালু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর ইতস্তত করে বললেন, পুলিশকে নিশ্চয়ই।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি বালিশের নিচে থেকে ছোট শিশিটা বের করলাম, ভিতর থেকে একটা হালকা নীল আলো বের হচ্ছে। কাছে মুখ নিয়ে বললাম, হে মহাকাশের আগন্তুক।

ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তারপর শুনলাম সেটি বলল, বিলু। দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন।

প্রাণীটা আবার আমাকে গালি দিচ্ছে, আমার এত খারাপ লাগল যে বলার নয়। থতমত খেয়ে বললাম, আমি আসলে বুঝতে পারি নি, একেবারেই বুঝতে পারি নি—

ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তারপর একটা কাতর শব্দ করল প্রাণীটা, বলল, বিপদ, মহাবিপদ, আটানব্বই দশমিক তিন চার বিপদ—

কার বিপদ?

আমার।

কী বিপদ?

প্রাণীটা কোনো কথা না বলে ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করতে থাকে। আমি

==========

আবার জিজ্ঞেস করলাম, কী বিপদ? কী হয়েছে?

প্রাণীটা কোনো উত্তর দিল না, ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করতে থাকল। আমার মনে হল শব্দটা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে। প্রাণীটা যদি মরে যায় তখন কী হবে?

আমার তখন এই প্রাণীটার জন্যে এত মন-খারাপ হয়ে গেল, বলার নয়। আহা বেচারা, না-জানি কোন দূর-দূরান্তের এক গ্রহ থেকে এসে এখানে কী বিপদে পড়েছে! কি বিপদ বলতেও পারছে না! বাংলা যে বলতে পারে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। মানুষের মতো কথা বলে না, অন্যরকমভাবে বলে, তাই সবাই শুনে বুঝতে পারে না। ছোট খালা যেরকম বোঝেন নি। এখন এত দুর্বল হয়ে গেছে যে আর কথাও বলতে পারছে না। কী করা যায় আমি চিন্তা করে পেলাম না। ছোট খালুকে কি ডেকে তুলে বলব? কিন্তু কী বলব? মহাকাশের প্রাণী একটা হোমিওপ্যাথিক শিশিতে অসুস্থ হয়ে আছে? একজন ডাক্তার ডাকা দরকার? ছোট খালু তো বিশ্বাসই করবেন না। স্যারকে বলতে পারলে হত, কিন্তু এই মাঝরাতে স্যারকে আমি কোথায় পাব?

আমি অনেকক্ষণ বসে বসে চিন্তা করলাম। প্রাণীটাকে যখন পেয়েছি তখন সেটাকে ঘিরে ছিল অসংখ্য পিঁপড়া। পিঁপড়াগুলো মনে হচ্ছিল প্রাণীটাকে কোনোভাবে সাহায্য করছিল। প্রাণীটা যদি আমার সাথে কথা বলতে পারে, নিশ্চয়ই তাহলে পিঁপড়াদের সাথেও কোনোরকম কথা বলতে পারে। মানুষের মতো পিঁপড়াদের এত বুদ্ধি নেই, তাদের সাথে কথা বলা হয়তো আরো সহজ। আমি আবার যদি প্রাণীটাকে পিঁপড়াদের মাঝে ছেড়ে দিই, তাহলে কি কোনো লাভ হবে?

কোনো ক্ষতি তো আর হতে পারে না।

আমি খুঁজে খুঁজে কয়েকটা পিঁপড়া বের করে শিশিটার কাছে এনে ছেড়ে দিলাম। পিঁপড়াগুলো সাথে সাথে শিশিটাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল, আর কী অবাক কাণ্ড, কিছুক্ষণের মাঝে দেখি পিঁপড়ার একটা সারি শিশিটার দিকে এগিয়ে আসছে। শিশিটাকে গোল হয়ে ঘিরে পিঁপড়াগুলো দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ভিতর থেকে আবার ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ হতে থাকে, শব্দটি আগের থেকে অনেক দুর্বল। আমি সাবধানে শিশিটার মুখ খুলে দিলাম, সাথে সাথে একটা পিঁপড়া ভিতরে ঢুকে গেল। সেটা বের হয়ে এল একটু পরে, তখন আরেকটা পিঁপড়া ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেটা বের হয়ে এলে আরেকটা। পিঁপড়াদের মাঝে একটা উত্তেজনা, ছুটে যাচ্ছে ছুটে আসছে, মুখে করে কিছু-একটা আনছে, কিছু-একটা নিয়ে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দটা অনেক বেড়েছে। আমি শিশিটার ভিতরে তাকালাম, সেখানে কিছু নেই। শব্দটা কোথা থেকে আসছে দেখার জন্যে আমি এদিকে-সেদিকে তাকালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা নীল আলো ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ করে সেটা আমার দিকে এগিয়ে এসে ঠিক নাকের কাছাকাছি থেমে গেল, শুনলাম সেটা বলল, মস্তিষ্কের কম্পন স্তিমিত, শারীরিক নিয়ন্ত্রণ লুপ্ত—।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম?

==========

হ্যাঁ।

সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় সময়ের অপচয়। সময়ের অপচয়—

জিনিসটা ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠে গিয়ে আবার নিচে নেমে এল। বলল, বুদ্ধিমত্তার হার শতকরা চুয়াল্লিশ দশমিক তিন।

কার?

তোমার।

সেটা ভালো না খারাপ?

ভালো? খারাপ? ভালো? খারাপ? জিনিসটা উত্তর না দিয়ে আবার ঘুরপাক খেতে থাকে। মনে হচ্ছে এর সাথে কথাবার্তা চালানো খুব সহজ নয়। কিন্তু যে–বিপদের কথা বলছিল সেটা মনে হয় কেটে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মহাবিপদ হয়েছিল বলেছিলে, সেটা কেটেছে?

চল্লিশ দশমিক চার।

সেটা কম না বেশি?

কম? বেশি ? কম? বেশি ? জিনিসটা উপরে–নিচে করতে থাকে।

আমি হাল ছাড়লাম না, জিজ্ঞেস করলাম, পিঁপড়াগুলো কি তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছে?

লৌহ তাম্র কোবাল্ট এবং অ্যান্টিমনি।

এগুলো এনে দিয়েছে?

বাস্তবিক। স্বর্ণ কিংবা প্লাটিনাম চাই। স্বর্ণ । স্বর্ণ।

সোনা দরকার তোমার?

বাস্তবিক।

সোনা না হলে কী হবে?

গতিবেগ রুদ্ধ।

কার গতিবেগ রুদ্ধ?

মহাকাশযানের।

কতটুকু দরকার?

ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম।

সেটা কতটুকু?

ছয় দশমিক তিন—ছয় দশমিক তিন—বলে জিনিসটা আবার ঘুরপাক খেতে থাকে। ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম সোনা খুব বেশি নয়, কিন্তু যত কমই হোক, সোনা আমি কোথায় পাব? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

এন্ড্রোমিডা। এন্ড্রোমিডা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে? সত্যি?

সত্যি? সত্যি? সত্যি?

সে তো অনেক দূরে। কেমন করে এলে?

স্পেস টাইম সংকোচনের অস্থিতিশীল অবস্থায় মূল কম্পনের চতুর্থ পর্যায়ের সর্বশেষ বিস্ফোরণের ফলে যে সময় পরিভ্রমণের ক্রান্তিধারা হয় তার দ্বিতীয় পর্যায়ে.....

==========

আমি হাত তুলে থামালাম, তুমি একা এসেছ?

একা? একা? একা?

কতদিন থাকবে তুমি?

স্বর্ণ স্বর্ণ স্বর্ণ চাই। ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম স্বর্ণ চাই। আমার গতিবেগ রুদ্ধ।

ঠিক এই সময়ে দরজা খুলে ছোট খালা মাথা ঢোকালেন। বললেন, বিলু—

আমি তীষণ চমকে উঠলাম, ছোট খালা?

এত রাতে জেগে একা একা কথা বলছিস কেন?

আমি মানে ইয়ে—মানে—আমি থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। ছোট খালা ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, অনেক রাত হয়েছে, ঘুমা।

আমি তাড়াতাড়ি মশারি ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ছোট খালা বাতি নিভিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সাথে সাথে ঘরের কোনা থেকে জিনিসটি বের হয়ে এল, বলল, বিভ্রান্ত হোমোস্যাপিয়েন।

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

নাম? নাম? নাম?

হ্যাঁ, নাম।

সাত তিন আট দশমিক চার চার দুই মাত্রা সাত নয় উল্টো মাত্রা ছয় ছয় পাঁচ—

এটা তো নাম হতে পারে না। নাম হতে হবে ছোট।

ছোট?

হ্যাঁ, ছোট।

জিনিসটা এবার অদ্ভুত একটা শব্দ করল। হাঁচি আটকে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ হাঁচি বের হয়ে গেলে নাক এবং মুখ দিয়ে যেরকম অদ্ভুত একটা শব্দ বের হয়, শব্দটা অনেকটা সেরকম। আমি দু'বার সেটা অনুকরণ করার চেষ্টা করলাম, কোনো লাভ হল না। বললাম, তোমাকে অন্য একটা নাম দিই, যেটা ডাকা যায়?

অন্য নাম? নূতন নাম?

হ্যাঁ। তুমি যখন ছোট, তাই ছোট একটা নাম। ছোটন কিংবা টুকুন।

টুকুন? টুকুন? জিনিসটি ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করতে শুরু করল।

হ্যাঁ, তুমি যদি চাও তাহলে টুকুন ঝিঁঝি হতে পারে। কিংবা টুকুনজিল—

টুকুনজিল টুকুনজিল টুকুনজিল—জিনিসটা আমার মশারির চারদিকে ঘুরতে থাকে। আমার মনে হয় নামটা তার পছন্দ হয়েছে।

ঠিক আছে, তা হলে তোমার নাম হোক টুকুনজিল।

টুকুনজিল হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, বিভ্রান্ত হোমোস্যাপিয়েন।

বিভ্রান্ত কে?

বিভ্রান্ত এবং আতঙ্কিত হোমোস্যাপিয়েন।

আতঙ্কিত কে?

বিভ্রান্ত এবং আতঙ্কিত এবং স্তম্ভিত হোমোস্যাপিয়েন।

আমি হঠাৎ করে ছোট খালার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমার দরজার কাছ থেকে দ্রুত হেঁটে নিজের ঘরে যাচ্ছেন। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিলেন। কী সর্বনাশ।

==========

৮. ডাক্তার

সকালে ছো খালু জামাকাপড় পরে আমার ঘরে এসে বললেন, বিলু, আজকে তোমার স্কুলে যেতে হবে না।

স্কুলে যাব না?

না।

কেন খালু?

আমার সাথে একটু বাইরে যাবে।

বা–বাইরে? কোথায়?

একজনের সাথে দেখা করতে।

ছোট খালু বেশি কথা বলেন না, আমার তাই কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। কাল রাতের ব্যাপার নিয়ে কি কিছু হয়েছে?

কি ব্যাপার একটু পরেই বন্টুর কাছে জানতে পারলাম। সে আমার ঘরে উঁকি দিয়ে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। বন্টুর পিছনে মিলি। বন্টু মিলির দিকে তাকিয়ে বলল, কাছে যাস না, কামড়ে দেবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে কামড়ে দেবে?

তুমি।

আমি? কেন?

তোমার বাবার মতো তুমিও পাগল হয়ে যাচ্ছ। মা বলেছে।

আমি? আমি পা—পা—

মিলি বন্টুকে ধমক দিয়ে বলল, ভাইয়া, মা বলতে না করেছে না?

চুপ।

আমি উঠে দাঁড়াতেই বন্টু ছুটে বের হয়ে গেল, তার পিছনে পিছনে মিলি। দু'জনেই ভয় পেয়েছে আমাকে দেখে। আমার এমন মন–খারাপ হল যে বলার নয়।

গাড়িতে ছোট খালু বেশি কথা বললেন না। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, রাতে ভালো ঘুম হয়েছে, বিলু?

জ্বি, হয়েছে।

কখনো ঘুমাতে অসুবিধে হয় তোমার?

না, খালু।

বেশ, বেশ।

সারা রাস্তা আর কোনো কথা হল না। আমি গাড়িতে বসে এদিকে–সেদিকে দেখছিলাম, তখন দেখলাম একটা মাইক্রোবাস আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে আসছে। আমার মনে হল এই মাইক্রোবাসটাকে কয়দিন থেকে বাসার সামনে দেখছি। একটু পরে অবশ্যি মাইক্রোবাসটার কথা ভুলে গেলাম, এখানে তো কত মাইক্রোবাসই আছে!

মতিঝিলের কাছে একটা উঁচু দালানে লিফট দিয়ে আমাকে নিয়ে উঠে গেলেন ছোট

==========

খালু। একটা সরু করিডোর ধরে হেঁটে একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিলেন। দরজায় সোনালি অক্ষরে লেখা ডঃ কামরুল ইসলাম, নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।

ডাক্তার ছোট খালুর খুব বন্ধুমানুষ হবেন। দেখলাম একজন আরেকজনকে দেখে বাচ্চাদের মতো পেটে খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন। আর একটু পরপর হো হো করে হাসছেন। আমি এর আগে ছোট খালুকে কখনো জোরে হাসতে দেখি নি। একটু পর দু'জনেই সরে গিয়ে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, কারণ দু'জনেই খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, আর ''প্রেশার'' ''কালচার'' "ডিজওর্ডার'' ''ব্রাইট'' এরকম কঠিন কঠিন কয়েকটা শব্দ শুনতে পেলাম আমি। একটু পর ছোট খালু আমার কাছে এসে বললেন, বিলু, এ হচ্ছে ডক্টর কামরুল, তোমার ডাক্তার চাচা। তোমার সাথে খানিকক্ষণ কথা বলবেন। তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করবেন তুমি তার ঠিক উত্তর দেবে। ঠিক আছে?

খালু। আমার কিছু হয় নি, খালু। আমি ভালো আছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি অবশ্যি ভালো আছ।

তাহলে কেন—

ভালো থাকলেও ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। চেক-আপের জন্যে যেতে হয়। সবাই যায়।

ডাক্তার চাচা খুব ভালোমানুষের মতো আমার হাত ধরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, তোমার খালু আর আমি যখন ছোট ছিলাম একসাথে অনেক মারপিট করেছি।

আমি আবার তাকালাম তাঁদের দিকে। তাঁরা একসময় ছোট ছিলেন এবং মারপিট করেছেন ব্যাপারটা বিশ্বাসই হতে চায় না। ডাক্তার চাচা মুখে হাসি টেনে বললেন, তোমার খালু আমাকে বলেছেন যে তুমি নাকি অসম্ভব ব্রাইট ছেলে। গ্রামের একটা স্কুল থেকে স্কলারশিপে পুরো ডিস্ট্রিক্টের মাঝে প্রথম হয়েছ।

আমি কিছু বললাম না, একটু মাথা নাড়লাম।

ডাক্তার চাচা বললেন, তোমার বাবার নাকি একটু মানসিক ব্যালেন্সের সমস্যা আছে। বোঝই তো, কারো বেশি হয় কারো কম। আমি তাই তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই, কারণ, দেখা গেছে অনেক সময় এগুলো জিনেটিক হয়। জিনেটিক মানে বোঝ তো? বংশগত। বাবার থেকে ছেলে, ছেলে থেকে তার ছেলে। তোমার মতো এরকম একজন ব্রাইট ছেলে, তার নিজের উপর কন্ট্রোল থাকা খুব দরকার। ঠিক আছে?

জ্বি।

এবারে বল, তুমি কি কখনো কিছু দেখতে পাও, যেটা অন্যেরা দেখতে পায় না।

না।

কখনো কিছু শুনতে পাও যেটা অন্যেরা শুনতে পায় না?

ইয়ে-আগে কখনো হয় নি। কিন্তু সেদিন—

সেদিন কি?

সেদিন মহাকাশের আগন্তুকের সাথে দেখা হল, সে যখন কথা বলে তখন অন্যেরা

==========

মনে হয় বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে না?

না। তারা শুধু ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ শোনে।

কে শুনেছে সেটা?

ছোট খালা।

ও। একটু থেমে ডাক্তার চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ঝিঁঝি পোকা?

জ্বি।

তুমি কি অন্য কোনো পোকার কথা শুনতে পার? কিংবা অন্য কোনো প্রাণী? কুকুর, বেড়াল, পাখি? কাক? দাঁড়কাক?

হঠাৎ করে কেন জানি আমার রাগ উঠতে থাকে। বড়দের সাথে রাগ করে কথা বলতে হয় না, তাই আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বললাম, না।

শুধু ঝিঁঝি পোকার শব্দ?

আমি কখনো বলি নি যে আমি ঝিঁঝি পোকার শব্দ শুনতে পারি। আমি বলেছি—

কী বলেছ?

আমি বলেছি মহাকাশের যে-আগন্তুক এসেছে তার কথা অন্যেরা শোনে ঝিঁঝি পোকার শব্দের মতো।

কেন সেটা হয় বলতে পার?

আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মহাকাশের আগন্তুকের কথা বললাম, কিন্তু ডাক্তার চাচা সেটা নিয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। কথাটা শুনে অবাকও হলেন না। পুরো ব্যাপারটাতে কোনো গুরুত্ব দিলেন না, সেটা দেখে আমার আরো রাগ উঠতে লাগল, তবুও অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে রাখলাম। ডাক্তার চাচা জিজ্ঞেস করলেন, কেন অন্যেরা শুনতে পায় না তুমি জান?

একটু একটু জানি।

কেন?

আমার মনে হয় সে আমাদের মতো কথা বলে না। একটা তরঙ্গ পাঠায়, সেটা সোজাসুজি আমাদের মাথার মাঝে, মগজের মাঝে কম্পন তৈরি করে। সেটার থেকে আমরা বুঝি সে কী কথা বলছে। একেকজনের মগজ একেক রকম, তাই একেকজনের জন্যে একেক রকম কম্পন দরকার। মহাকাশের আগন্তুক আমার কম্পনটা ধরতে পেরেছে, সে ঠিক তরঙ্গটা পাঠায় তাই আমি তার কথা বুঝতে পারি। অন্যেরা বোঝে না। যখন অন্যদের জন্যে পাঠাবে তখন আমি বুঝব না। শুধু একটা শব্দ শুনব ঝিঁঝি পোকার শব্দের মতো।

ডাক্তার চাচা মনে হল আমার কথা শুনে খুব অবাক হলেন। একবার খালুর দিকে তাকালেন, তারপর আমার দিকে তাকালেন, তারপর কাগজে ঘসঘস করে কী-একটা লিখলেন। একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, এই প্রাণীটা কোন গ্রহ থেকে এসেছে? মঙ্গল গ্রহ?

মঙ্গল গ্রহে কোনো প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া আর কোনো গ্রহে প্রাণ নেই।

তাহলে কোথা থেকে এসেছে?

==========

এন্ড্রোমিডা থেকে।

সেটা কোথায়?

আমাদের নেবুলার নাম হচ্ছে ছায়াপথ। ইংরেজিতে বলে মিল্কিওয়ে। আমাদের পরেরটা হচ্ছে এন্ড্রোমিডা। সেখানকার কোনো নক্ষত্রের কোনো–একটা গ্রহ থেকে।

সেটা নিশ্চয়ই অনেক দূর। সেখান থেকে কেমন করে এল?

আমাকে বলেছে, আমি বুঝি নি। স্পেস টাইমের কী–একটা ব্যাপার আছে। একরকম সংকোচন হয়, তখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ডাইভ দিয়ে চলে যায়। সময়ের ক্ষেত্র ব্যবহার করে স্থানের ক্ষেত্রে শর্টকাট দেয়ার মতো।

ডাক্তার চাচা ঢোক গিলে বললেন, সেই প্রাণীটা তোমাকে বলেছে এটা?

এভাবে বলে নি, আমি এভাবে বললাম। সোজাসুজি মগজের মাঝে কথা বলে, তাই তার সব কথা বুঝতে না পারলেও কী বলতে চায় বুঝতে পারি।

ডাক্তার চাচা ঘসঘস করে খানিকক্ষণ লিখে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথায় আছে সেই প্রাণী?

জানি না। রাতে আমার ঘরে ছিল।

তুমি আর কাউকে এটা বলেছ?

না, এখনো বলি নি।

সেটা দেখতে কী রকম?

অনেক ছোট, তাই ভালো করে দেখতে পারি নি।

ছোট? ডাক্তার চাচা মনে হল খুব অবাক হলেন।

হ্যাঁ। অনেক ছোট। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুব কষ্ট করে একটু দেখা যায়।

এত ছোট?

হ্যাঁ।

তুমি কি জানতে এটা ছোট হবে?

আমি কেমন করে জানব?

তুমি এখনো কাউকে এটা বল নি?

না।

কাউকে বলবে ঠিক করেছ?

হ্যাঁ। আজকে স্কুলে গেলে স্যারকে বলতাম।

তোমার স্যার?

হ্যাঁ। আমাদের ক্লাস টিচার। স্যারের খুব উৎসাহ।

ও। ডাক্তার চাচা আবার ঘসঘস করে অনেক কিছু লিখে ফেললেন কাগজে। তারপর স্যারের কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। স্যার কি করেন, ক্লাসে কাকে বেশি পছন্দ করেন, কাকে বেশি অপছন্দ করেন। আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তারপর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন, অনেক খুঁটিনাটি জিনিস জানতে চাইলেন। বাবার পর আমার নিজের সম্পর্কে জানতে চাইলেন, কী করতে ভালবাসি, কী খেতে ভালবাসি, কোন রং আমার পছন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। সবার শেষে আমাকে অনেকগুলো ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী মনে করি। একটা বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা নিলেন আমার, নানারকম নকশা দেখে ঠিক উত্তরটা বেছে নেবার একটা পরীক্ষা।

==========

তারপর আবার কাগজে ঘসঘস করে কী যেন লিখলেন। তারপর অনেকক্ষণ বসে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত খালুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর ভাগ্নে খুব ব্রাইট। অসম্ভব হাই আই কিউ। আমার মনে হয় তাকে সোজাসুজি বলে দেয়া ভালো। তোর আপত্তি আছে?

খালু মাথা নাড়লেন, না, নেই।

ডাক্তার চাচা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাস, খুব কম বাচ্চা তার বাবাকে এত ভালবাসে।

আমি মাথা নাড়লাম।

কিন্তু তোমার বাবা পুরোপুরি স্বাভাবিক নন, তাই তাঁর সাথে তোমার কখনো সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে নি। তোমার বুকের ভিতরে সেটা নিয়ে বুভুক্ষের মতো একটা ক্ষুধা আছে।

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

এখানে এসে স্কুলে তোমার যে-স্যারের সাথে পরিচয় হয়েছে, সেই স্যারের সাথে তোমার বাবার একটু মিল রয়েছে। তুমি তোমার নিজের বাবার কাছে যেটা পাও নি, সেটা তোমার স্যারের মাঝে তুমি খোঁজা শুরু করেছ। তোমার স্যার খুব ভালো মানুষ, ছাত্রদের নিজের সন্তানের মতো করে দেখেন—তুমিও গোপনে তাঁকে তোমার বাবার মতো করে দেখা শুরু করেছ। তোমার স্যার যেটাই বলেন তুমি সেটা গভীরভাবে বিশ্বাস কর। তাঁকে খুশি করার জন্যে তোমার অবচেতন মন নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। তাই যখন তোমার স্যার মহাকাশের প্রাণীর কথা বলেছেন, সেটাও তুমি এমনভাবে বিশ্বাস করেছ, যে—

ডাক্তার চাচা একটু থেমে খালুর দিকে তাকালেন, তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সত্যিই বিশ্বাস করা শুরু করেছ যে সত্যি সত্যি মহাকাশের একটা আগন্তুক তোমার কাছে এসে গেছে। এরকম হয়—একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষকে খুব ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে, তখন এরকম হয়। এর একটা ডাক্তারি নামও আছে।

আমি ঢোক গিলে বললাম, তার মানে আপনি বলছেন টুকুনজিল আসলে নেই?

টুকুনজিল?

হ্যাঁ। মহাকাশের আগন্তুককে আমি টুকুনজিল নাম দিয়েছি।

ও।

আপনি বলছেন টুকুনজিল আসলে নেই?

না। আসলে সব তোমার কল্পনা। মানুষ একটা জিনিস যদি খুব বেশি চায়, সেটা নিয়ে যদি তার ভিতরে একটা বড় ধরনের দুঃখ কিংবা ক্ষোভ থাকে, সেটা যদি সে তার প্রকৃত জীবনে না পায়, তখন সে সেটা কল্পনায় পেতে চেষ্টা করে। সেটা কোনো দোষের ব্যাপার নয়, সবার জীবনেই নানারকম ফ্যান্টাসি থাকে। খানিকটা ফ্যান্টাসি থাকা ভালো। কিন্তু কখনো যদি কেউ কল্পনা এবং সত্যিকার জীবনে গোলমাল করে ফেলে, বুঝতে না পারে কোনটা কল্পনা এবং কোনটা সত্যি, তখন অসুবিধে। আমরা তাদের বলি মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। তোমার বাবা সেরকম একজন মানুষ। কল্পনা এবং বাস্তব জীবনের মাঝে পার্থক্যটা ধরতে পারেন না। তোমার ভিতরেও তার

==========

লক্ষণ আছে—

আমার ভিতরে?

হ্যাঁ। তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে, তাই তোমাকে সোজাসুজি বললাম। যদি তুমি নিজে একটু সতর্ক থাক, তাহলে নিজেই বুঝবে কোনটা সত্যি, কোনটা কল্পনা। যখন বুঝতে পারবে তুমি কল্পনাকে সত্যি মনে করছ, তখন নিজেকে জোর করে কল্পনার জগৎ থেকে সরিয়ে আনবে। কল্পনা করতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কল্পনাকে কখনো সত্যি বলে ভুল করতে হয় না। বুঝেছ?

বুঝেছি। আমার গলা শুকিয়ে গেল। তার মানে আমিও বাবার মতো পাগল।

তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমার ভিতরে অসম্ভব মনের জোরের চিহ্ন পেয়েছি। তুমি এর ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। আমি জানি। তোমার বাবার যেটা হয়েছে তোমার সেটা হবে না। কখনো হবে না। ঠিক আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

বাসায় এসে বালিশে মাথা রেখে আমি খানিকক্ষণ কাঁদলাম। আমি ভেবেছিলাম মহাকাশের রহস্যময় এক প্রাণীর সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে। আসলে সব আমার পাগল–মাথার কল্পনা। সবাই এখন জেনে যাবে যে আমি পাগল। ছোট খালু বলবেন ছোট খালাকে। ছোট খালা থেকে জানবে বন্টু আর মিলি। তাদের থেকে জানবে তাদের অন্য বন্ধুরা। সেখান থেকে একসময় জানবে আমার ক্লাসের ছেলেরা। সবাই তখন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কী লজ্জার কথা! একবার মনে হল ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন শেষ করে দিই। আরেকবার মনে হল সব ছেড়েছুড়ে আমি এখনই বাড়ি চলে যাই, সেখানে বাবার হাত ধরে আমরা দুইজন পাগল–মানুষ নীল গাঙের তীরে বসে থাকি।

অনেকক্ষণ বসে বসে আমি ভাবলাম, তারপর নিজেকে সাহস দিলাম। ডাক্তার চাচা বলেছেন আমার মনের জোর আছে, আমি ভালো হয়ে যেতে পারব। আমি নিশ্চয়ই তার চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। মন–খারাপ করে থেকে লাভ কি?

আমি সোজা হয়ে বিছানায় বসেছি আর সাথে সাথে ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর শুনলাম পরিষ্কার গলায় কে যেন বলল, তোমার মস্তিষ্কের দুই পাশে অন্ত তরঙ্গ। অসামঞ্জস্য এবং ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম।

আমি চমকে উঠলাম। কী সর্বনাশ! আবার আমি টুকুনজিলের কথা শুনছি। আমি দুই হাতে কান চেপে ধরলাম, টুকুনজিলের কথা শুনতে চাই না আমি—পাগল হয়ে যেতে চাই না। মনে মনে বললাম, চলে যাও চলে যাও তুমি।

আমি যাব না।

তুমি যাও। তুমি কল্পনা। তুমি মিথ্যা। আমি মনে মনে উচ্চারণ করতে থাকি, তুমি কল্পনা, তুমি কল্পনা, তুমি কল্পনা।

আমি কল্পনা না! না না না। আমি টুকুনজিল।

আমার গলা শুকিয়ে গেল, আমি মুখে কোনো কথা উচ্চারণও করি নি, কিন্তু টুকুনজিল আমার কথার উত্তর দিচ্ছে। ডাক্তার চাচা তাহলে কি সত্যি কথাই বলেছেন? আসলেই সব কল্পনা? আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। আমি ভালো

==========

হয়ে যাব, এইসব উল্টোপাল্টা ব্যাপারকে কোনো পাত্তা দেব না। চোখ বন্ধ করে নিজেকে বললাম, সব কল্পনা। সব কল্পনা।

না। কল্পনা না।

তুমি চলে যাও। আমার মন থেকে চলে যাও।

যাব না। যাব না। সাহায্য চাই।

কচু সাহায্য। তুমি দূর হয়ে যাও।

যাব না। স্বর্ণ চাই। প্লাটিনাম চাই।

নিজে জোগাড় করে নাও।

পারছি না। আমার গতিবেগ রুদ্ধ। আমি গতিহীন। শক্তিহীন। চোখ খোল। চোখ খুলে আমাকে দেখ।

আমি আবার চোখ খুলে তাকালাম। সত্যি সত্যি আমার চোখের সামনে ছোট একটা কালো বিন্দুর মতো কী–একটা ঝুলছে। টুকুনজিলের মহাকাশযান, নাকি আমার কল্পনা? আমি আবার চোখ বন্ধ করলাম। বললাম, চলে যাও তুমি।

যাব না। যাব না। যাব না।

কেন যাবে না?

যেতে পারব না। সাহায্য চাই। আমাকে খুঁজছে। আমাকে ধরতে আসছে। আমার বিপদ।

তোমার বিপদ, তুমি কচুপোড়া খাও।

আমি কচুপোড়া খাই না। আমাকে সাহায্য কর তুমি।

কিন্তু তুমি তো নেই, তুমি কল্পনা।

আমি কল্পনা না। আমি প্রমাণ করব। তুমি হাত বাড়াও।

আমি আস্তে আস্তে হাত বাড়ালাম, দেখলাম বিন্দুটি আমার হাতের উল্টোপৃষ্ঠায় নেমে এল, হঠাৎ একঝলক আলো জ্বলে উঠল, আর আমি চিৎকার করে হাত টেনে নিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম গোল হয়ে পুড়ে গেছে হাতের চামড়া, মুহূর্তে ফোস্কা পড়ে গেছে হাতে। প্রচণ্ড জ্বালা করছে হাত, কিন্তু আমি যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম হাতের দিকে। তাহলে কি সত্যিই টুকুনজিল আছে?

তোমার অন্য হাত দাও।

কেন?

আরেকটা বৃত্তাকার উত্তপ্ত চিহ্ন করে দেখাই।

না না, আর দেখাতে হবে না।

এখন তুমি বিশ্বাস কর আমি সত্যি?

প্রচণ্ড জ্বালা করছে হাত। কিন্তু এটাও কি কল্পনা হতে পারে? কাউকে দেখাতে হবে আমার। আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম, বাসার কাজের ছেলেটিকে খুঁজে পেলাম না, তাকে দেখাতাম। বন্টু হেঁটে যাচ্ছিল, তাকেই ডাকলাম আমি, বন্টু, দেখ তো একটা জিনিস।

কি?

আমার হাতের উপর কি তুমি কিছু দেখতে পাও?

দেখি। বন্টু হাতটা একনজর দেখেই চিৎকার করে উঠল, সিগারেটের ছ্যাঁকা! ইয়া

==========

আল্লাহ্, তুমি সিগারেট খাও?

তারপর সে গরুর মতো চেঁচাতে শুরু করল, আম্মা, আম্মা দেখে যাও। বিলু সিগারেট খায়। সিগারেটের ছ্যাঁকা—

ছোট খালা দৌড়ে এলেন, কি হয়েছে? কি?

দেখ, বিলু সিগারেট খেতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা খেয়েছে। দেখ, গোল ছ্যাঁকা।

ছোট খালা হাতের পোড়া দাগটা খুব ভালো করে দেখলেন, তারপর আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, আমার শরীরে সিগারেটের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে পুড়েছে?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, না মানে—ইয়ে—।

টুকুনজিলের কথা শুনতে পাই আমি, দেখেছ? আমি সত্যি। আমি কল্পনা না।

আমি ভয়ে ভয়ে তাকালাম। ছোট খালা বা বন্টু টুকুনজিলের কথা শুনতে পায় নি, শুধু আমি শুনেছি।

ছোট খালা বললেন, কথা বলছিস না কেন? কেমন করে পুড়েছে?

বন্টু চিৎকার করে বলল, সিগারেট। সিগারেট।

টুকুনজিল বলল, অকাট্য প্রমাণ আমি সত্যি। অকাট্য প্রমাণ।

আমি চোখ বন্ধ করলাম, মহা ঝামেলায় ফেঁসে গেছি আমি, কিন্তু একটা কথা তো সত্যি।

আমি পাগল না।

মহাকাশের রহস্যময় প্রাণী সত্যি আছে।

সত্যি আছে।

৯. সোনার আংটি

মহাকাশের আগন্তুক টুকুনজিল সত্যি আছে, সে সুদূর এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পৃথিবীতে এসেছে, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা পাগলের মতো তাকে খুঁজছে, সারা পৃথিবীর মাঝে শুধু আমি জানি সে সত্যি আছে এবং কোথায় আছে। শুধু আমার সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে, শুধু আমি জানি সে দেখতে কেমন। সে কথা আমি কাউকে বলতে পারছি না, ডাক্তার চাচাকে বলেছিলাম, তিনি বিশ্বাস তো করেনই নি, উল্টো ধরে নিয়েছেন আমিও আমার বাবার মতো পাগল! একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, কারণ যতক্ষণ টুকুনজিল তার মহাকাশযান ঠিক করতে না পারছে ততক্ষণ সে চায় না অন্য কেউ জানুক সে কোথায় আছে। আমাকে তাই বলেছে, সারা পৃথিবীর মাঝে আমি তার একমাত্র বন্ধু, আমি যদি তার কথা না শুনি কে শুনবে? কাজেই আমার পেটের মাঝে এত বড় খবরটা ভুটভুট করতে থাকে, কিন্তু আমি বের করতে পারছি না।

টুকুনজিল এক টুকরা সোনা বা প্লাটিনামের জন্যে একেবারে জান দিয়ে ফেলছে। সকালে উঠে ঠিক করলাম আজ তাকে সেটা জোগাড় করে দেব। প্লাটিনাম কোথায় পাব আমি, তবে সোনা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। ছোট খালার শরীর-ভরা গয়না,

==========

হাতে কয়েকটা আংটি, কানে দুল, হাতে চুড়ি। কোনো-একটা কি আর কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে নেয়া যাবে না? টুকুনজিল নেবে মাত্র ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম সোনা, ছোট খালা জানতেও পারবেন না।

সকালে নাস্তা করার সময় দেখতে পেলাম ছোট খালার আঙুলে আংটিগুলো নেই, তার মানে নিশ্চয় খুলে রেখেছেন। খুলে রাখার জায়গা খুব বেশি নেই, হয় শোয়ার ঘরে, ড্রেসিং টেবিলের উপরে, নাহয় লাগানো বাথরুমে। আমি ব্যবহার করি বন্টু আর সীমার বাথরুম, কাজেই কোনোরকম সন্দেহ সৃষ্টি না করে শোওয়ার ঘরের বাথরুমে যাওয়া সহজ নয়। তবে কপাল ভালো থাকলে হয়তো বাথরুম পর্যন্ত যেতে হবে না, ড্রেসিং টেবিলের উপরেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সে জন্যে আমাকে শোওয়ার ঘরে যেতে হবে। কী ভাবে যাওয়া যায়?

ছোট খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, ছোট খালা, আজকের পেপার কি এসেছে?

এসেছে নিশ্চয়ই। কেন?

আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে বলেছে তার চাচার একটা খবর উঠবে আজকে। সরল মুখ করে একটা নির্দোষ মিথ্যা কথা বললাম।

কী খবর?

অবিরাম সাইকেল চালনা। ছিয়াত্তর ঘন্টা নাকি হয়েছে। মিথ্যা কথা বলার এই হচ্ছে সমস্যা, একটা বললে শেষ হয় না; সেটাকে সামলে নেবার জন্যে একটানা মিথ্যা বলে যেতে হয়।

কোথায় সাইকেল চালাচ্ছে?

নরসিংদি। ছোট খালুর কি পড়া শেষ হয়েছে খবরের কাগজ?

জানি না, দেখ গিয়ে।

সাথে সাথে আমি শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেলাম, ছোট খালু নিশ্চয়ই বাথরুমে, ঘরঘর শব্দ করে গলা পরিষ্কার করছেন। বিছানার উপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে, সেটা তুলে নেবার আগে ড্রেসিং টেবিলের উপর তাকালাম, কী কপাল! সত্যি সত্যি ছোট খালার সোনার আংটি দুইটা! চট করে একটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম, আগে এরকম বড় জিনিস কখনো চুরি করি নি, বুকটা ধক্‌ধক্ করে শব্দ করতে থাকল।

খাবার টেবিলে বসে মিছেই খবরের কাগজটা দেখার ভান করতে থাকলাম। বন্টু জিজ্ঞেস করল, উঠেছে খবরটা?

নাহ্।

আমি তখনই বুঝেছিলাম গুলপট্টি। তিন দিন কোনো মানুষ একটানা সাইকেল চালাতে পারে? পিশাব-পাইখানা?

আমার ঘরে এসে আমি ফিসফিস করে ডাকলাম, টুকুনজিল—

সোনা এনেছ?

হ্যাঁ। চুরি করে এনেছি, ধরা পড়লে একেবারে জান শেষ হয়ে যাবে।

জান শেষ হয়ে যাবে? মেরে ফেলবে তোমাকে? হৃৎস্পন্দন থেমে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবে? স্নায়ু—

ওটা একটা কথার কথা। জান শেষ হবে মানে মহা বিপদ। এই আংটিটা আমি

==========

ঘুলঘুলির উপর লুকিয়ে রাখি। তুমি যেটুকু ব্যবহার করতে চাও ব্যবহার কর, তারপর ফিরিয়ে দিতে হবে ধরা পড়ার আগে।

ফিরিয়ে দিতে হবে কেন?

সোনার আংটি ফিরিয়ে দিতে হবে না? কতক্ষণ লাগবে তোমার?

তিন ঘন্টা তেত্রিশ মিনিট বারো সেকেন্ড।

এতক্ষণ লাগবে? খামচি মেরে একটু সোনা নিয়ে আংটিটা ফেরত দিতে পারবে না?

না। আমার মহাকাশযানের বৈদ্যুতিক যোগাযোগে অনেক বড় সমস্যা। এই জন্যে স্বর্ণ প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক সুপরিবাহী মৌলিক পদার্থ। তিন ঘন্টা তেত্রিশ মিনিট বারো সেকেন্ড।

বন্টু বাইরে থেকে ডাকে, বিলু, ড্রাইভার এসে গেছে।

আমি চেয়ারে পা দিয়ে ঘুলঘুলির উপর সোনার আংটিটা রেখে বের হয়ে এলাম।

গাড়িতে ওঠার সময় শুনলাম ছোট খালা বলছেন, ড্রেসিং টেবিলের উপর আংটিটা রেখেছিলাম, কোথায় গেল?

আমি না শোনার ভান করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। মনে হয় আমার কপালে বড় দুঃখ আছে আজ!

বন্টু আর মিলিকে স্কুলে নামিয়ে দেবার পর ড্রাইভার আমাকে আমার স্কুলে নামিয়ে দেয়। আজকাল প্রায়ই আমি বন্টুর স্কুলে নেমে পড়ি, সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে আমার স্কুলে আসি। ড্রাইভার বেশ খুশি হয়েই আমাকে নামিয়ে দেয়, সকালের ভিড় ঠেলে গাড়ি চালাতে তারও বেশি ভালো লাগে না মনে হয়। তা ছাড়া আমাকে নামিয়ে দিয়ে সে রাস্তা থেকে কিছু লোক তুলে একটা খেপ দিয়ে কিছু বাড়তি পয়সা বানিয়ে নেয়। হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতে আমার বেশ লাগে। কত রকম মানুষজন, কত রকম দোকানপাট দেখা যায়।

স্কুলে যাবার সময় কয়দিন থেকে আমার একটা আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছে। শুধু মনে হয় কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। টুকুনজিলের সাথে ভাব হবার পর আজকাল অবশ্যি আর কিছুতেই বেশি অবাক হই না। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে মহাকাশের এক আগন্তুক এই পৃথিবীতে এসে শুধু আমার সাথে যোগাযোগ করেছে, জিনিসটা চিন্তা করতেই আমার বুকের ভিতর কেমন জানি শিরশির করতে থাকে। ইস! কাউকে যদি বলা যেত, কী মজাটাই—না হত।

কিন্তু এই অনুসরণের ব্যাপারটা অন্যরকম। সাদা রঙের একটা মাইক্রোবাস আমি প্রায়ই দেখি। ড্রাইভারের পাশে একজন লাল রঙের বিদেশি বসে থাকে। আমার কেন জানি মনে হয় মাইক্রোবাসটা আমার পিছু পিছু যেতে থাকে। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমি যদি পিছনে ঘুরে তাকাই, মনে হয় মাইক্রোবাসটা থেমে যায় আর লাল রঙের মানুষটা চট করে আমার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। আমি কেমন জানি নিঃসন্দেহ হয়ে যাই যে টুকুনজিলের সাথে এর একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে কী করা যায় সেটা শুধু বুঝতে পারছিলাম না।